
মাসুদ রানা
ইশকাপনের টেক্কা
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

ইশকাপনের টেক্কা

কাজী আনোয়ার হোসেন

আমেরিকায় খুন হয়েছেন সিক্রেট-ইলেভেনের প্রতিভাবান ফিযিসিস্ট ডক্টর আলী আহমেদ। তাঁর আবিষ্কৃত লেযার-সুইচটা আমেরিকার হাতে পড়ার আগেই উদ্ধার করতে হবে। নইলে গোটা পৃথিবীকেই এবার ক্রীতদাস বানাবে ওরা।
অ্যাসাইনমেন্ট নিল অপ্রস্তুত রানা।
কথা ছিল সিআইএ-র সাহায্য পাবে। কিন্তু প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনের কম্পাউন্ডে ঢোকার আগেই হামলা শুরু হয়ে গেল। শত্রুপক্ষ ভাল করেই জানে ও আসলে ডক্টর আলী আহমেদ নয়।
লেযার সুইচটা কেড়ে নিতে চাইছে বিদেশি শক্তি।
মরতে মরতে বারবার বেঁচে যাচ্ছে রানা।
কিন্তু ভাগ্যের সহায়তা কী বারবার পাওয়া যায়?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

<কার্টেসি>

থ্রিলারখেকো

এক

মরুভূমির উপর নীল আকাশে দেখা দিল রুপালি চিহ্নটা, ক্রমেই কাছে চলে আসছে। চকচক করছে ওটা সূর্যের রশ্মিতে। একটু পর শোনা গেল জেট ইঞ্জিনের গম্ভীর গুঞ্জন। ঠিক তখনই গোটা আকাশ ঝলসে উঠল তীব্র, লম্বাটে, চোখ ধাঁধানো ঝিলিকে।

আলোর একটা তীক্ষ্ণ বর্শা উপর দিকে ছুটে গেল, যেন গরম ছুরি দিয়ে মাখন কাটছে, ড্রোন প্লেনটাকে ভেদ করে অদৃশ্য হয়ে গেল শূন্যে। একটা মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীন ভাবে টলমল করল প্লেনটা, তারপর মাধ্যাকর্ষণ ওটার জ্বলন্ত, গলিত টুকরোগুলোর দখল নিয়ে নিল। ছাই আর জঞ্জালগুলো নীচে পড়তে শুরু করল এবার।

নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষা করা হলো বিশ্বের প্রথম দূরপাল্লার সফল লেযার ক্যানন।

'অনেক বেশি কাছে ছিলাম আমরা,' গম্ভীর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল প্রতিভাবান বাঙালি বিজ্ঞানী আলী আহমেদের ঠোঁটে। ঝাড়া দিয়ে শার্টের হাতা থেকে ধুলো ঝাড়লেন।

'ঠিক বলেছেন, স্যার,' তোষামোদের হাসি হাসল সিকিউরিটি অফিসার। 'অন্যদের সঙ্গে বাঙ্কারে থাকলেই ভাল হতো।'

'তবে এতে ক্ষতি কম হয়েছে,' বললেন বিজ্ঞানী। 'ওখানে বুড়ো সিনেটরদের কড়া সিগারের বিশ্রী ধোঁয়ায় আয়ু কমে যেত।'

'খুশিতে নিশ্চয়ই নাচছেন এখন তাঁরা,' আন্দাজ করল সিকিউরিটি অফিসার। 'এবার এই প্রজেক্টে প্রচুর অর্থবরাদ্দ পেতে

কোন অসুবিধে হবে না আমাদের।'

মনে মনে হাসলেন আলী আহমেদ। যা ঘটতে চলেছে তাতে নাচ থেমে যাবে আমেরিকানদের। এক অর্থে গতকাল থেকে জিম্মি হয়ে গেছে আমেরিকান সরকার। বাংলাদেশের সাহায্য ছাড়া আর কারও পক্ষে তাঁর আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম ওই লেযার সুইচ তৈরি করা সম্ভব হবে না। এমনকী শুরু থেকে আবার গবেষণা না করলে তাঁর নিজের পক্ষেও নয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রজেক্টের কম্পাউন্ডের ভিতর সিকিউরিটি ভল্টে কাগজপত্র না রেখে কর্তৃপক্ষকে অসন্তুষ্ট করে বাড়িতে গবেষণা করেই ফর্মুলা নিখুঁত করেছেন তিনি। তাঁর গবেষণার সমস্ত ফাইল ই-মেইলের সঙ্গে অ্যাটাচ করে তিনদিন আগে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ই-মেইল করেছেন তাঁর গুরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ফিযিসিস্ট প্রফেসর ইর্তিজা মাহমুদের কাছে। তারপর এখানে কাগজ-পত্র যা ছিল, সবকিছু গুবলেট করে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কিছু মুছে দিয়ে, কিছু উল্টোপাল্টা নানান রকম অর্থহীন সংখ্যা ও শব্দ বসিয়ে। ই-মেইল করার আগে কম্পিউটারে ব্যবহার করেছেন নিজের তৈরি স্ক্র্যাম্বলার। কারও সাধ্য নেই ওগুলোর কপি জোগাড় করে, যদি না বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের উঁচু পদের কেউ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে।

'দারুণ একটা জিনিস, কী বলেন, সার?' আলী আহমেদকে নীরব দেখে জিজ্ঞেস করল অফিসার। বিনকিউলার দিয়ে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দেখছে সে। 'আমি বরং ওখানে যাই, টাম্বলউইডে আগুন ধরে গেছে, দাবানল শুরু হবার আগেই আগুনটা নেভাতে হবে।'

'যান, ক্যাপ্টেন, নিভিয়ে ফেলুন।' লেযার যে বাঙ্কারে আছে, সেখানে যাবেন, গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন আলী আহমেদ। রশ্মি বিচ্ছুরণের আগে কামানটা সামান্য নড়েছে, ব্যাপারটা চোখ এড়ায়নি তাঁর। নিশ্চয়ই বেযের কোন বল্টু ঢিলে রয়ে গেছে।

পিছনে স্টার্ট নিল অফিসারের জীপ, একগাদা ধুলো উড়িয়ে ছুটল পতিত প্লেনের দিকে।

যাও, মনে মনে বললেন আলী আহমেদ, খানিকক্ষণের জন্য রেহাই দাও আমাকে।

ঢালের উপর যেন থাবা বিস্তার করে আছে বাঙ্কারটা। ভিতরে আবছা অন্ধকার। এখানে ওখানে গাড়ির সমান আকৃতির ক্যাপাসিটরগুলো বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ করে শান্ত। মেইন কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আলী আহমেদ, প্রোগ্রাম চেক করে দেখছেন। মনোযোগ অন্যদিকে থাকায় দেখতে পেলেন না কখন দরজা দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকেছে ভিতরে। লোকটা লেযার ক্যাননের বেযের বল্টুগুলো দ্রুত খুলে ফেলল একটা রেঞ্চ দিয়ে, তারপর সরে গেল ছায়ায়। সেকেন্ডারি কম্পিউটার রিপ্রোগ্রামিং করছে সে এখন।

ক্যাননের বেযের কাছে চলে এলেন আলী আহমেদ। ঝুঁকে তাকালেন কোনও বল্টু ঢিলে হয়ে আছে কি না দেখতে। বিস্মিত হয়ে দেখলেন সবগুলো বল্টুই খোলা। মনে মনে বললেন, এ অসম্ভব! এবার মৃদু একটা কড়কড় আওয়াজ শুনতে পেলেন।

মুখ তুললেন আলী আহমেদ, ঘাড় কাত করে শুনবার চেষ্টা করলেন। ক্যাপাসিটর চার্জ হবার পরিচিত মৃদু গুঞ্জন তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে বাধ্য করল। ক্যাপাসিটরগুলোর উপরের ইমার্জেন্সি ডিসচার্জ রডগুলোয় নীল বিদ্যুতের শিখা নাচতে দেখলেন। আরেকবার মারণরশ্মি ছুঁড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে লেযার ক্যানন।

'ব্যাপারটা কী!' বিস্মিত স্বরে বাংলায় বলে উঠলেন আলী আহমেদ। দ্রুত মেইন কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে এসে ইমার্জেন্সি ওভাররাইড বাটনে চাপ দিলেন। ক্যাপাসিটর রিচার্জ হওয়া থামার কথা। কিন্তু থামছে না।

বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না আলী আহমেদ, তবে রেগে গেলেন। ইকুইপমেন্ট ম্যালফাংশান এই প্রজেক্টে লেগেই আছে। তিনি

যতোই ভাল জিনিসের অর্ডার দিন না কেন, আমেরিকান পার্চেয ডিপার্টমেন্টের গাধাগুলো সবসময় সবচেয়ে কমদামি বাজে জিনিস সাপ্লাই দেয়। কোথাও নিশ্চয়ই একটা সেফটি সুইচ নষ্ট আছে, সেজন্যই ওভাররাইড বাটন কাজ করছে না।

মেইন কন্ট্রোল প্যানেল চেক করে দেখলেন। ওটা ঠিক মতোই কাজ করছে। ওখান থেকে সরে সেকেন্ডারি কন্ট্রোল প্যানেলে ডিফেক্টিভ সুইচ খুঁজতে শুরু করলেন আলী আহমেদ। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে মেইন কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে এলো ছায়ামূর্তি। দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় কম্পিউটার জেনে গেল ওটার কী করতে হবে।

লেযার ক্যাননটা ছাদের স্লটের দিক থেকে সরে গেল, নেমে এলো বাঙ্কারের ভিতরে। বেযের বল্টুগুলো না থাকায় মাতালের মতো এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল জিনিসটা।

'ব্যাপারটা কী!' আবার বলে উঠলেন আলী আহমেদ। ক্যাপাসিটরে যাওয়া ইলেকট্রিসিটির স্রোত বন্ধ করতে পারছেন না তিনি। প্রায় ছুটে মেইন কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে ফিরে এলেন। এবার দেখতে পেলেন মুখোশ পরা মূর্তিটাকে। লোকটা প্যানেলের সামনে ঝুঁকে আছে, ব্যস্ত হাতে কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম করছে।

'কে তুমি!' গর্জে উঠলেন আলী আহমেদ। 'ঢুকলে কী করে? এটা সিকিউরিটি এরিয়া!'

'অপেক্ষা করুন,' অদ্ভুত শান্ত একটা চাপা গলা শুনতে পেলেন ডক্টর আহমেদ।

লেযার কামানটা চোখের কোণে দেখতে পেয়ে বরফের মতো জমে গেলেন বিজ্ঞানী। আস্তে আস্তে ঘুরছে কামান, ঘুরছে সরাসরি তাঁর দিকে! যে-বল্টুগুলো কামানটাকে বাঙ্কারের ভিতর তাক করতে বাধা দিত সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে ওটা এখন বাঙ্কারের ভিতর লক্ষ্যস্থির করছে। ক্যাপাসিটরের কড়কড় আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলেন, ওগুলো লেযার ছুঁড়ার জন্য

প্রায় তৈরি। কামানের শক্তির কোটি ভাগের একভাগ বা তারও কম, সামান্য একটু রশ্মিই তাঁকে ছাই করে দিতে যথেষ্ট।

'ধরবেন না কিছু!' ত্রস্ত পায়ে সামনে বাড়লেন আলী আহমেদ। 'মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে। আমি...'

'যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, নইলে আমি কামানটা ব্যবহার করব,' শান্ত শীতল গলায় জবাব দিল ছায়ামূর্তি। লোকটার বলার ভঙ্গি এতোই নিস্পৃহ যে আলী আহমেদ বিশ্বাস করে ফেললেন, লোকটা যা বলছে তা করতে দ্বিধা করবে না।

থমকে দাঁড়ালেন আলী আহমেদ। 'কী চান আপনি?' গলা কেঁপে গেল তাঁর।

'আপনার তো বাঙ্কারে আসার কথা নয়,' খানিকটা অভিযোগের সুরে বলল রহস্যময় লোকটা। 'পরীক্ষা সফল হয়েছে কি না সেটা সিনেটরদের সঙ্গে দেখলেই পারতেন।'

মৃত্যুর একটা আলাদা গন্ধ আছে। সেই ঠাণ্ডা, জাগতিক অথচ অপার্থিব গন্ধই পেলেন আলী আহমেদ। আস্তে আস্তে দরজার দিকে সরতে শুরু করলেন তিনি। তারপর স্নায়ুর চাপ সহ্য করতে পারলেন না, দৌড় দিলেন দরজা লক্ষ্য করে।

আর কয়েক ফুট। আর মাত্র কয়েক ফুট যেতে পারলেই কামানের বৃত্তাকার রশ্মির আওতার বাইরে চলে যেতে পারবেন তিনি। তারপর গাড়িতে উঠে রেডিও করবেন সিকিউরিটির কাছে। একমিনিটও লাগবে না, ঘিরে ফেলা হবে বাঙ্কার। প্রজেক্টের শেষদিকে এসে সর্বক্ষণ সতর্ক হয়ে আছে আমেরিকান প্রহরীরা।

কামানের মুখের কাছে গোল একটা আলোর রেখা দেখতে পেলেন। লোকটা লেযারের অটোমেটিক ফায়ারিং সিকোয়েন্স ট্রিগার করে দিয়েছে! এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র ভাবার সময় পেলেন আলী আহমেদ। সামনে ঝাঁপ দিলেন তিনি। দড়াম করে পড়লেন কংক্রিটের মেঝেতে। ঠিক তাঁর মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে ছুটে গেল মৃত্যু-রশ্মি। বাঙ্কারের পুরু

রিইনফোর্সমেন্ট কংক্রিটের দেয়াল আইসক্রিমের মতো গলে গেল। ঝলসানো ইলেকট্রিকাল যন্ত্রপাতির টুকরোটাকরা ঝরে পড়ল উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আলী আহমেদের পিঠে। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন তিনি।

এগিয়ে এসেছে ছায়ামূর্তি। গায়ের জোরে হাতের ভারী রেঞ্চটা নামিয়ে আনল সে আলী আহমেদের মাথার পিছনে। চোখের সামনে হাজার-রঙা বাতি দেখতে পেলেন বিজ্ঞানী, তারপর সব নিভে গেল। শুধুই অন্ধকার। তারপর তা-ও না।

এর তিন মিনিট পর যেন বিস্ফোরিত হলো গোটা বাঙ্কারের ভিতরটা। দরজা দিয়ে গলগল করে বের হলো তীব্র আগুনের নীল হলকা। ছায়ামূর্তি ততক্ষণে সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে।

'দুঃখিত, ডক্টর আহমেদ,' বিড়বিড় করে বলল সে।

অ্যাম্বুলেন্সটা অ্যালবাকার্কির মধ্যবিত্ত আবাসিক এলাকায় পিকেট ফেন্স দেওয়া সাদা রঙের একটা বাড়ির সামনে থামল। খুলে গেল অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দরজা। দু'পাশ থেকে ধরে ধরে নামানো হলো ব্যান্ডেজ মোড়া ডক্টরকে। মাতালের মতো টলছেন আলী আহমেদ। মেল নার্সরা ধরে রেখেছে তাঁকে। ভদ্রলোকের সাদা ব্যান্ডেজ ঢাকা আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে সদ্য মমি করা হয়েছে তাঁকে, মরার আগেই।

ভদ্রলোক নামতেই চারপাশ থেকে ঘিরে এলো সাংবাদিকরা। বারংবার ঝলসে উঠছে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।

'ডক্টর, এক মিনিট প্লিজ!'

'একটু দাঁড়ান, ডক্টর আহমেদ!'

'ছবি তোলো, রবিন্স!'

'আসলে কী ঘটেছে ওখানে, ডক্টর?'

'আপনার অবস্থা এখন কেমন?'

সাংবাদিকদের ব্যস্ততা আর ব্যগ্র হাবভাব দেখে মনে হলো

চিড়িয়াখানায় নতুন প্রজাতির কোন চমকপ্রদ কিম্ভূতকিমাকার জীব এসেছে, সবার আগে খবরটা নিউজ-এডিটরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

খুলে গেল পিছনের বাড়িটার দরজা, বছর পঁচিশেকের ছোটখাট এক মহিলা ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলো। 'আসতে দিন ওঁকে! উনি অসুস্থ!'

আস্তে করে হাত তুলে নাড়লেন ডক্টর। 'সামান্য!'

মহিলাকে দেখেই ঘিরে ফেলা হলো তাকেও।

'মিসেস আহমেদ, আপনার স্বামী সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

'এই দুর্ঘটনার পর কী ভাবছেন আপনি?'

ধাক্কা দিয়ে একজন রিপোর্টারকে সরিয়ে দিল মহিলা। 'ওঁর বিশ্রাম দরকার। বিরক্ত করবেন না, প্লিজ!'

'ডক্টর আহমেদ, আপনি কি আবার কাজে যোগ দিচ্ছেন?' মহিলার কথায় কান দিল না রিপোর্টার।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছবি তুলছে কয়েকজন ফটোগ্রাফার, মেল নার্সদের ছেঁকে ধরেছে রিপোর্টারের দল।

ব্যান্ডেজের কারণে ঘামছেন ডক্টর, মরুভূমির শুকনো আবহাওয়া তাঁর ঘাম শুকিয়ে দিচ্ছে। খানিকটা অসহায় বোধ করছেন তিনি। তারপর স্ত্রীকে সাহায্য করতে কী করা উচিত ভেবেই যেন দু'জন সাংবাদিককে সরিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যান্ডেজের ভিতর দিয়ে ক্লান্ত, জড়ানো, অস্পষ্ট গলায় বললেন, 'প্রজেক্ট ইনফরমেশন অফিসার জানাবেন যা জানানোর। প্লিজ, চলে যান আপনারা। আমার স্ত্রী বিপর্যস্ত। আমিও অত্যন্ত অসুস্থ।'

কেউ আরও কোন প্রশ্ন করার আগেই স্ত্রীর পাশে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি, বাগান পেরিয়ে ঢুকে গেলেন বাড়ির ভিতর। সজোরে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে টের পেলেন, ব্যান্ডেজের কারণে ঠিকমতো হাত নাড়তে পারছেন না। পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, দরকারের সময় চট্ করে তাঁর ওয়ালথার পিপিকে

বের করতে পারবেন না!

বিসিআই হেডকোয়ার্টার। মতিঝিল। ঢাকা।

'বসো, সোহেল।' সিগার তাক করে ওকে সামনের চেয়ারটা দেখালেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। সোহেল বসার পর খোলা ফাইলটা ঠেলে দিলেন। 'পড়ো।' কপালের একটা শিরা তিরতির করে কাঁপছে তাঁর। কিছুটা যেন অনিশ্চিত দেখাচ্ছে কঠোর বুড়োকে।

পাশের চেয়ারে বসা বৃদ্ধ প্রফেসরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফাইলে দ্রুত চোখ বুলাতে শুরু করল বিসিআইয়ের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ।

ছয় পৃষ্ঠার বিস্তারিত রিপোর্ট।

ডক্টর আলী আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিযিক্সে এম.এসসি-র পর অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করেন। তারপর দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

রিপোর্টের মূল অংশে চলে গেল সোহেল। নিজের জবানীতে লিখেছেন বিজ্ঞানী।

আমি ডক্টর আলী আহমেদ, জন্মসূত্রে বাঙালি। পাঁচ বছর আগে আমেরিকান সিটিযেনশিপ গ্রহণ করি এবং ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমেরিকান ডিফেন্সের একটা প্রজেক্টে রিসার্চের কাজে যোগ দিই। কথা ছিল: আমার গবেষণার সুফল আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকেও ভোগ করতে দিতে হবে। পরবর্তীতে আমি একটা লেযার সুইচ আবিষ্কার করি। জিনিসটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য নীচে দেওয়া হলো:

পড়ে গেল সোহেল, পরবর্তী দুটো পৃষ্ঠায় কীভাবে লেযার ক্যানন তৈরি করা যাবে সে-ব্যাপারে জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন আলী আহমেদ। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর তৈরি নিখুঁত লেযার সুইচের উপর। ম্যাচ-বাক্স আকৃতির অত্যন্ত সক্ষ

একটা স্পর্শকাতর, ছোট্ট যন্ত্র ওটা। লিখেছেন, মাত্র দুটো সুইচ তৈরি করেছেন। দুটোর একটা তাঁর মতে একেবারেই সাধারণ; অন্যটার উপমা দিয়েছেন: ইশকাপনের টেক্কা। লিখেছেন, সুযোগ পেলেই তিনি ওটা নষ্ট করে ফেলবেন। কারণ, সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেই তিনি টের পেয়েছেন, চোখ উল্টে নিয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। ওরা এখন আর বাংলাদেশকে চিনতে পারছে না। ওই সুইচ দুর্নীতিগ্রস্ত আমেরিকান সরকারের হাতে পড়ুক, এবং তার ফলে গোটা দুনিয়ার সর্বনাশ হোক তা তিনি চান না।

'লিখেছেন সুইচটা নষ্ট করে ফেলবেন,' ফাইল থেকে চোখ তুলল সোহেল।

প্রফেসর ইর্তিজার দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। খুকখুক করে কেশে নিয়ে বৃদ্ধ প্রফেসর বললেন, 'তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আলী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে ওর থিওরি, তাতে যে-কোন ভালো ফিযিসিস্ট মাস খানেক চেষ্টা করলেই সুইচটা তৈরি করতে পারবে। আমি পড়ে দেখেছি, ফর্মুলায় কোনও খুঁত নেই। জিনিসটা ও নষ্ট করে থাকলেই ভাল।'

আবার পড়তে শুরু করল সোহেল। আলী আহমেদ লিখেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ জিনিসটা খুলে ওটা কীভাবে কাজ করে তা জানতে পারবে না। ভঙ্গুর কাঁচের ভিতর রেখেছেন জটিল এবং অতি সূক্ষ্ম, চিকন সার্কিটগুলো। কাঁচের উপর সামান্য আঁচড়ও জিনিসটাকে পাউডার বানিয়ে দেবে। নিয়ম না জেনে কেউ খুলবার চেষ্টা করলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ওই সুইচ। ওটা তৈরি করার এবং খুলবার কৌশলও জানিয়েছেন তিনি।

লেযার ক্যানন দিয়ে সরাসরি দু'হাজার মাইল দূর থেকে বিমান বা রকেট ধ্বংস করা ছেলেখেলা। প্রয়োজনে মহাশূন্য থেকে আসা পৃথিবী-বিধ্বংসী অ্যাস্টরয়েডও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে মুহূর্তে। তবে বর্তমানে রিচার্জ হতে অনেক সময় নেয় ক্যাপাসিটরগুলো। তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম সুইচটা লেযার প্রক্ষেপণের

বিরতি বহুগুণ কমিয়ে এনেছে। দ্বিতীয় সুইচটা, অর্থাৎ ইশকাপনের টেক্কা এই সময় কমিয়ে দিয়েছে আরও বহুগুণ।

আণবিক বোমা বহনকারী ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের কার্যকারিতা এতে করে একেবারেই নগণ্য হয়ে যাবে। পরপর অনেকগুলো মিসাইল ছুঁড়লেও আঘাত হানতে পারবে না শত্রুপক্ষ। কোনও দুর্বল রাষ্ট্রও যদি ওটার একক মালিকানা পায় এবং যুদ্ধের কাজে সেটা ব্যবহার করে, তাহলে পাল্টে যাবে গোটা দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্য। জিনিসটাকে এই শতাব্দীর সেরা যুদ্ধাস্ত্র বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

এরপর আলী আহমেদের কিছু ব্যক্তিগত বিষয় স্থান পেয়েছে রিপোর্টে।

শেষদিকে এক জায়গায় লিখেছেন: আমার স্ত্রী খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত, কিন্তু তাকেও এখন পর্যন্ত কিছুই জানাইনি আমি। মন বলছে, জিনিসটা নিখুঁত হয়েছে টের পেলেই আমেরিকান কর্তৃপক্ষ স্রেফ কেড়ে নেবে ওটা আমার কাছ থেকে। কিছুই করার থাকবে না আমার। তাই জন্মভূমিকে আমার জীবনের সেরা আবিষ্কারের ফর্মুলাটা উপহার দিচ্ছি।

ফাইল থেকে চোখ তুলল সোহেল।

'খুন হয়েছেন ডক্টর আলী আহমেদ,' গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন রাহাত খান। চেহারাটা থমথম করছে। সিগারে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। 'বুঝতে পারছি, ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন তিনি। গবেষণার শেষে এসে ধারণা করছিলেন আমেরিকানরা জিনিসটার একক মালিকানা পেলে ওদের দুর্বল দেশের ওপর অন্যায় আগ্রাসন সীমা ছাড়াবে।'

আরও গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। 'একটু আগে সিআইএ চীফ যোগাযোগ করেছিল। আমাদের সাহায্য চায়। এ-ব্যাপারে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে তার। আপাতত ডক্টরের মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে। প্রচার করা হয়েছে

তাঁর শরীর মারাত্মক ভাবে ঝলসে গেছে। গিসিসটা খুঁজে পাচ্ছে না ওরা কোথাও। সিআইএ চীফ চাইছে ডক্টরের বদলে ওখানে ঢুকে খুনিকে খুঁজে বের করুক রানা। সম্ভব হলে গিসিসটাও। এতে ডক্টরের স্ত্রীরও সম্মতি আছে।' একটু থামলেন বৃদ্ধ। সরাসরি চাইলেন সোহেলের চোখে। 'মেয়েটা বিয়ের আগে সিআই-এর এজেন্ট ছিল। মনে রেখো, রানাকে তার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলতে হবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল সোহেলের। এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'সার, ওরা চাইছে রানা ডক্টরের ছদ্মবেশ নিয়ে রিসার্চ সেন্টারে ঢুকুক। কিন্তু সিআইএর পরিকল্পনা আমার কাছে খুবই কাঁচা মনে হচ্ছে। শুরুতেই সহকর্মীদের কাছে ধরা পড়ে যাবে ও।' প্রফেসরের দিকে তাকাল ও। 'ডক্টর আহমেদের বক্তব্য কতটা খাঁটি, কতটা নির্ভরযোগ্য বলে আপনার ধারণা, সার?'

প্রফেসর ইর্তিজা মাহমুদের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল রাহাত খানও। আস্তে করে মাথা নাড়লেন প্রাজ্ঞ প্রফেসর। 'আলীর বক্তব্য একশো ভাগ নির্ভরযোগ্য। আমার শিক্ষক জীবনে ওর মতো সৎ আর প্রতিভাবান ছাত্র আর পাইনি আমি। ফর্মুলাটা আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখেছি আমি। যদি পরীক্ষা না-ও করতাম তবুও জোর দিয়ে বলতে পারতাম, 'ও যদি বলে লেযার ক্যাননটা এ শতাব্দীর সেরা যুদ্ধাস্ত্র, তা হলে সেটাই সত্য।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন বিসিআই চীফ, সোহেলের দিকে তাকালেন। 'রানার সঙ্গে ডক্টরের দৈহিক আকৃতি অনেকটা মিলে যায়। গায়ের রঙও। এই যে তার ছবি। রানা আর তার মধ্যে প্রচুর মিল। দু'জনেই সুদর্শন, সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত...' সোহেলের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখে থেমে গিয়ে কড়া চোখে তাকালেন। সিগারে জোর টান দিয়ে নিজের সামনে ঘন ধূম্রজাল সৃষ্টি করে ফেললেন। 'যা বলছিলাম, ব্যান্ডেজের কারণে রানা ডক্টর আলী আহমেদ নয় সেটা সহজে ধরতে পারবে না কেউ। সেজন্যেই

আমেরিকানরা চাইছে ভিতর থেকে তদন্ত করুক ও। তবে তার আগে ভালভাবে ব্রিফ করতে হবে ওকে।' টিপয়ের উপর রাখা গ্লাস তুলে দু'চুমুক পানি খেলেন রাহাত খান। 'অবশ্য ব্যাপারটায় আমরা না জড়ালেও পারি। লেযার ক্যানন আর লেযার-সুইচ তৈরির ফর্মুলা আমাদের হাতে চলে এসেছে।' তীক্ষ্ণ চোখে সোহেলকে দেখলেন তিনি।

'কিন্তু, সার...' প্রায় প্রতিবাদ করে উঠল আলোচনায় নিমগ্ন সোহেল। 'কেউ একজন ভদ্রলোককে খুন করেছে। তাঁর জায়গায় রানা গেলে ডক্টরের তৈরি নিখুঁত লেযার সুইচটা আমাদের হাতে চলে আসতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, হয়তো মৃত্যুর আগে ওটা নষ্ট করার সুযোগ পাননি ডক্টর আহমেদ।'

'ঠিক।' চুরুটে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন গম্ভীর রাহাত খান। 'আমিও তা-ই ভেবেছি। আর আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধে, আমেরিকান কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহায়তা পাবে রানা...একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত। ওরা দ্বিতীয় লেযার সুইচের বিশেষত্ব জানে বলে মনে হয় না আমার। ডক্টর বোধহয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা গোপন রাখতে পেরেছেন, নইলে সিআইএ চীফের আচরণে খানিকটা হলেও অস্বাভাবিকতা থাকত। ডক্টর আলী আহমেদের থিসিস পাচারের ব্যাপারে সামান্যতম কোনও ইঙ্গিত দেয়নি সে।'

কট্টর বুড়ো মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের জাদুকর, তাঁর যখন মনে হয়নি সিআই-এর চীফ দ্বিতীয় লেযার সুইচের বৈশিষ্ট্য জানে, তার মানে সেটাই সত্যি হবার সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বুই ভাগ। আমেরিকানদের কাছ থেকে সুইচটা সরিয়ে আনা, বা তা না পারলে ধ্বংস করে দেওয়া মঙ্গলজনক একটা কাজ হবে। সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'সার, আমরা কি রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি?'

আরও গম্ভীর হয়ে উঠল রাহাত খানের চেহারা। লাস ভেগাসে আছে রানা। বেপরোয়া ছোকরা সেখানে কীভাবে ছুটি কাটাচ্ছে

সে-সম্বন্ধে তাঁকে খানিকটা ধারণা দিয়েছে ওখানকার বিসিআই স্লীপার এজেন্ট। খুকখুক করে কাশলেন রাহাত খান। 'না। সিআইএ চীফ যোগাযোগ করবে, রানাকে জানাবে এতে আমার সম্মতি আছে। তাকে আমি ফ্যাক্স পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে আমি চাই আমেরিকানদের আগেই রানার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি। ও আগে থেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকুক। ওকে জানিয়ে দিয়ো, ওর মূল কাজ সুইচটা উদ্ধার বা নষ্ট করা; তবে আমি চাই, যদি সম্ভব হয়, তা হলে ডক্টর আলী আহমেদের খুনি কে, সেটা বের করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুক ও।'

লিন্ডার ঠোঁটের আধ ইঞ্চি দূরে ঠোঁট নিয়ে গেল রানা। বিলাসবহুল সুইটে রাবার-ফোমের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা। রানার রোমশ বুকে হাত বুলাচ্ছে মেয়েটা। দু'জনের পরনেই জন্মক্ষণের পোশাক।

মেয়েটা এই হোটেলের পাশেই একটা ক্যাসিনোয় পোকার ডিল করে। রানা কয়েকদিনের টুকরো আলাপ থেকে জেনেছে, হার্ভার্ড থেকে ফিলসফিতে মাস্টার্স করার পর উত্তেজনার খোঁজে এখানে কাজ নিয়েছে লিন্ডা।

অপূর্ব সুন্দরী। ওকে অপ্সরা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। ডিম্বাকৃতি মুখ। নীল গভীর আয়ত চোখে মায়াময় চাহনি। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, মেদহীন রমণীয় শরীর। কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ সোনালী চুল। আঁটসাঁট শরীরটা যে-কোন নামকরা সুপার-মডেলকে ঈর্ষায় ফেলে দেবে।

তিনদিন হলো খাতির করার চেষ্টা করছে রানা মেয়েটার সঙ্গে। ক্যাসিনোতে জিতেছে প্রচুর, তারপর দু'হাতে খরচও করেছে, কয়েক দফা যেচে আলাপ করে নিজের প্রতি মেয়েটার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। এখন ধৈর্যের সুফল ভোগ করার সময়। একটু আগে নামকরা একটা ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার

সেরে এসেছে ওরা। লিন্ডা নিজেই রিনরিনে মিষ্টি কণ্ঠে প্রস্তাব দিয়েছে, 'চলো না, মরিস, তোমার সুইটে বসি? দু'এক চুমুক শ্যাম্পেন এখন মন্দ লাগবে না আমার।'

প্রস্তাবটা শুনে মনে মনে হেসেছে রানা। শ্বেতাঙ্গিনী যখন ওর সুইটে শ্যাম্পেন পর্যন্ত রাজি, তখন ধরে নেওয়া যায় কেল্লা অর্ধেক ফতে। বড়শিতে মাছ ভাল ভাবেই গেঁথেছে, এখন শুধু সুতো টেনে তোলার অপেক্ষা।

প্রথম চুমুটা হলো কোমল আর ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয়টা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং আবেগঘন। তৃতীয় চুমুটা আর দেওয়া হলো না। ক্রিংক্রিং করে বিছানার পাশে ছোট টেবিলে রাখা ইন্টারকম বেজে উঠল।

রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'হ্যালো, মিস্টার রেনার? ডেস্ক থেকে বলছি। আপনার কাছে লোক এসেছেন। একটা মেসেজ দিয়েছেন ভদ্রলোক। পাঠিয়ে দেব, সার?'

'দিন।'

'পাঠিয়ে দিয়েছি, সার।' রিসেপশনিস্টের গলার আওয়াজে মনে হলো নিজের বুদ্ধিতে কাজটা করে সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট, নিজেকে অতি বুদ্ধিমান ভাবছে।

রানা রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল লিন্ডা। রানা বলল, 'লোক এসেছে দেখা করতে।'

'এখন?' ঠোঁট ফোলাল লিন্ডা। 'তুমি নিশ্চই আমাকে ফেলে যাবে না?'

কী বলবে ভেবে পেল না রানা। সম্ভবত সিআইএ থেকেই এসেছে কেউ। সোহেলের ব্রিফিং অনুযায়ী সেক্ষেত্রে যেতে ওকে হবেই। নীরবতায় কেটে গেল পাঁচ সেকেন্ড, তারপর যেন অনিচ্ছুক রানাকে উদ্ধার করতেই ঠক্-ঠক্ করে দরজায় টোকা দিল বেলবয়। রিসেপশনিস্ট দেরি করেনি।

ঝট্ করে ওর কাছ থেকে সরে গেল লিন্ডা, নেমে পড়ল বিছানা থেকে, দ্রুত হাতে ব্লাউজ আর স্কার্ট পরল, তারপর নিতম্বে মোহনীয় ছন্দ তুলে সোফায় গিয়ে বসল।

দরজায় টোকার পর টোকা দিচ্ছে লোকটা। দু'বার থাবড়াও দিল।

মধু মাখানো কণ্ঠ শোনা গেল।

'স্যার!'

বিরক্ত চেহারায় বিছানা ছেড়ে উঠল রানা, পোশাক পরে নিল, তারপর লিন্ডার অগোচরে বালিশের নীচ থেকে ওয়ালথার পিপিকে বের করে দরজার পাশে চলে এলো।

'কে?'

'বেলবয়, স্যার। আপনার জন্যে জরুরি একটা মেসেজ আছে।'

ল্যাচ খুলে দরজাটা একটু ফাঁক করল রানা, ওয়ালথার তৈরি, হাসি-হাসি একটা গোল ফরসা চেহারা দেখা গেল। তার হাতের ভাঁজ-করা কাগজটা নিয়ে দশ ডলার বকশিশ দিল হতাশ এবং কৌতূহলী রানা, তারপর দরজা বন্ধ করে চোখ বুলাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর।

'কী ব্যাপার, মরিস?' অধৈর্য সুরে জানতে চাইল লিন্ডা।

কাগজটা থেকে চোখ তুলল রানা। 'খুব জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল, লিন্ডা। আমাকে যেতে হচ্ছে এখুনি।'

নকল বিরক্তি ভুলে আদুরে ভঙ্গিতে ঠোঁট ফোলাল লিন্ডা। 'ওহ্ নোহ্! পরে যেয়ো? এক ঘণ্টা পর, প্লিইজ?'

'পারলে সত্যিই খুব খুশি হতাম, লিন্ডা।'

নীরবে তাকাল লিন্ডা রানার দিকে।

সামনে ঝুঁকে লিন্ডার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল রানা, আফসোস চেপে রেখে আলতো আলিঙ্গন করে বলল, 'সত্যি খারাপ লাগছে, কিন্তু যেতেই হচ্ছে আমাকে।'

হতাশ দেখাল লিন্ডাকে, খানিকটা যেন রেগেও গেছে। রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। 'ঠিক আছে, রেনার, পরে হয়তো দেখা হবে তোমার সঙ্গে, যদি অবশ্য আমার সময় হয়।' হাইহিলের খটাখট শব্দ তুলে দরজার কাছে চলে গেল মেয়েটা।

মুহূর্তের জন্য অসহায় বোধ করল ব্যর্থ-প্রেমিক। সম্পর্কটা সম্ভবত টুটেই গেল। কিন্তু কিছু করার নেই। আগামী অ্যাসাইনমেন্ট, সেটার গুরুত্ব এবং তাতে রাহাত খানের সম্মতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছে ওকে সোহেল। এ-কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়া না-হওয়া ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বুড়ো কবে জীবন যেতে পারে তেমন অ্যাসাইনমেন্ট না হলে ওকে এমনটা ভাবার সুযোগ দেয়? এই ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে বিপজ্জনক মনে না হলেও নিশ্চয়ই ফেলনা নয়? রক্তের ভিতর উত্তেজনা বোধ করল রানা।

সিআইএর পাঠানো কাগজে জানানো হয়েছে, নীচে ওর জন্য অপেক্ষা করছে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এক্ষুনি দেখা হওয়া খুব দরকার।

লিন্ডাকে শুকনো মুখে বিদায় জানিয়ে এলিভেটরে করে নেমে এলো রানা। হোটেলের সুইমিং পুলের পাশে লাউঞ্জ চেয়ারে বসে থাকা বুলডগের মতো চেহারার লোকটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না ওর। সিআইএর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ডগলাস ব্ল্যাকারসন। গুপ্তচরদের গোপন জগতে শুধু ব্যাড ডগ নামে পরিচিত। বিশ্রী, বদমেজাজি লোকটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে নেভা সিগার চিবাচ্ছে। এই মরুভূমির দেশেও পরনে তার থ্রী পিস সুট। ঘামছে দরদর করে।

তার পাশের চেয়ারে বসে পড়ে সরাসরি কাজের কথায় এল রানা। 'কী ব্যাপার? কে আমেরিকানদের 'কাঠ-পেন্সিল চুরি করেছে?'

জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'মিস্টার রানা, ঠাট্টা রাখুন।

আমাকে এখানে আপনার সঙ্গে মশকরা করতে পাঠানো হয়নি।' পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ বের করল লোকটা। 'এটা পড়লেই বুঝবেন।'

চারপাশে একবার চোখ বুলাল রানা। 'এখানে, এই খোলা জায়গায় পড়ব?'

উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে সুইমিং পুল। দু'জন সুঠামদেহী মহিলা ওখানে সাঁতার কাটছে। লাইফগার্ড নেই, তার বোধহয় ডিউটি অফ্। সুইমিং পুলের আরেক ধারে বিরাট ছাতার নীচে বসে আছে আরও কয়েকজন।

'এখানে যারা আছে সবাই আমাদের লোক,' নিচু গলায় বলল র‍্যাকারসন। 'পুরোটা জায়গা আমরা ইলেকট্রনিকালি সিকিওর করেছি। হোটেলের জানালা থেকেও কেউ আমাদের ঠোঁট দেখতে পাচ্ছে না। এবার আপনি সন্তুষ্ট, মিস্টার রানা?'

জবাব দিল না রানা, কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। প্রথম পৃষ্ঠা বিসিআই-এর কাছে পাঠানো আনুষ্ঠানিক অনুরোধের একটা কপি। পরের পৃষ্ঠায় সম্মতি প্রদান করে মেজর জেনারেল রাহাত খানের ফ্যাক্স। দু'মিনিট পর মুখ তুলে তাকাল রানা। চেহারায় প্রকাশ পেল না এসমস্ত আগেই জানানো হয়েছে ওকে।

'মার্ভ-এর নাম শুনেছেন?' নড়েচড়ে বসল জ্ঞানদাতা র‍্যাকারসন।

'মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি-টার্গেটেড রিএনট্রি ভেহিকল।'

'হ্যাঁ। মার্ভ।' রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল র‍্যাকারসন। 'এখন প্রতিটা আইসিবিএম-এ ছয়টার বেশি ওয়ারহেড থাকে। কাজেই আমাদের ডিফেন্স সিস্টেম নিখুঁত করার জন্যে এমন একটা অস্ত্র দরকার হয়ে পড়েছিল, যেটা আইসিবিএমকে যাত্রাপথেই ধ্বংস করতে পারে। কাজটা করতে হবে ডেলিভারি ভেহিকেল থেকে ওয়ারহেড রওনা হবার আগেই।'

চুপ করে থেকে লোকটাকে বকবক করতে দিল রানা।

বেশিরভাগ তথ্যই পুরোনো। এই লোকটাকে কেন পাঠানো হলো বুঝতে পারছে না রানা। সিআইএ-র অনেকেরই জানা আছে ... সঙ্গে মাসুদ রানার সাপে-নেউলে সম্পর্কের কথা।

'প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেন সে-ব্যাপারেই গবেষণা করছিল। একটা লেযার কামান তৈরি করেছিল তারা। ওটার রেঞ্জ দু'হাজার মাইল। জিনিসটা এক সেকেন্ডে যে-পরিমাণ এনার্জি বিচ্ছুরিত করে, তা দিয়ে অনায়াসে গোটা লাস ভেগাসের এক বছরের বৈদ্যুতিক চাহিদা মেটানো সম্ভব। আর যন্ত্রটার সবচেয়ে বড় সুবিধে, ওটা কখনোই ব্যর্থ হয় না।'

'কখনোই না?'

'না। আর কম্পিউটার যদি টার্গেট মিসও করে, আবার খুব অল্প সময়েই লেযার ছোঁড়া যায়। এখানেই প্রজেক্ট সিক্রেট ইলেভেনের গুরুত্ব। সাধারণ লেযার ক্যানন যে-কোন দেশ তৈরি করতে পারে, কিন্তু সেসব আমাদেরটার মতো লক্ষ্যভেদী এবং বিধ্বংসী নয়। সোজা কথায়, স্বল্প সময়ে প্রচুর বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত করতে পারে না বলে তীব্র লেযার ছুঁড়তে পারে না।'

'বলে যান।' মুখে বলল রানা। মনে মনে যোগ করল, সময়ের স্বল্পতার তুমি কী জানো, ডগ, ওটা জানে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ!

'আমাদের ধারণা রাশিয়ান কিংবা গণচিন প্রজেক্ট স্যাবোটাজ করছে। প্রজেক্ট ফিযিসিস্ট ডক্টর আলী আহমেদকে মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়। একটা সফল সামরিক প্রদর্শনীর পর লেযার ক্যাননটা পরীক্ষা করে দেখছিলেন তিনি। সে-সময় যেভাবেই হোক, ওটা সক্রিয় হয়ে ওঠে, গোটা বাঙ্কার পুড়ে যায়। প্রথম প্রোটোটাইপ ক্যাননটাও বিকল হয়ে পড়ে।'

রানা নড়েচড়ে বসল। 'রাশিয়ানরা বা চিনারা কেন? আপনাদের তো শত্রুর কোন অভাব নেই!'

'কারণ ডিযার্মামেন্ট নিয়ে আলাপে তারাই প্রস্তাব দিয়েছে,

আমরা যদি আমাদের লেযার প্রোগ্রাম স্থগিত করি, তা হলে তারা তাদের আণবিক প্রোগ্রাম বন্ধ করার কথা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করবে। রাশিয়ানরা আভাস দিয়েছে, তাদের স্পেস প্রোগ্রাম বন্ধ করতেও আপত্তি থাকবে না হয়তো।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে মরুভূমির রাতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে তাকাল রানা। এখানে ওখানে দু'একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। বাকিগুলোর অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে লাস ভেগাসের বৈদ্যুতিক বাতির জেল্লায়। উপরের আকাশে কোথাও এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে রাশিয়ান স্পেস স্টেশন, ওটার সতর্ক চোখ গোপনে নজর রাখছে আমেরিকানদের মিলিটারি ইন্সটলেশনগুলোর উপর। ওখান থেকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোকে সহজেই নিখুঁত লক্ষ্যে পরিচালিত করা সম্ভব।

তাতে বাংলাদেশের কী?

মেজর জেনারেলের ধারণা, দ্বিতীয় কামানের নিখুঁত লেযার সুইচটা নষ্ট করতে পারলেও ওর মিশন সফল হবে। আরও ভাল হয় যদি সুইচটা কোনভাবে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়া যায়। সেটা হয়তো সম্ভব হবে না, তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।

'মিস্টার রানা,' আবার শুরু করল র‍্যাকারসন। 'আপনার কাজ হবে ডক্টর আলী আহমেদের ছদ্মবেশে ওখানে গিয়ে তদন্ত করা। সন্দেহ নেই, আমাদের ইন্সটলেশনের ভিতরেই শত্রুপক্ষের লোক আছে। প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেন ব্যর্থ করে দিতে কাজ করছে সে বা তারা। প্রথম কাজ, তাকে ধরা। ডক্টর আহমেদের থিসিসটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। দ্বিতীয় কাজ, যে করে হোক সেটা উদ্ধার করা।'

'কীভাবে?' রানার ভ্রূ কুঁচকানো চেহারা দেখে মনে হলো কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়েছে।

'সেটা আপনি ওখানে পৌঁছলে নিজেই বুঝতে পারবেন। কারও সন্দেহ না জাগিয়ে তদন্ত করার সুযোগ পাবেন আপনি।

আপনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বাংলাদেশের এজেন্ট, কাজেই আপনাকে যতটা সম্ভব সাহায্য করব আমরা। ইন্সটলেশনের ভিতরে নিরাপদে আপনার ঢোকার ব্যবস্থা করা হবে। আমাকে এখনও জানানো হয়নি কীভাবে। তবে ইন্সটলেশনের কেউ জানবে না আপনি নকল লোক। টপ সিকিউরিটির লোকজনও না। আমরা চাই না শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে ওঠার সুযোগ পাক।' সামনে ঝুঁকে এলো ডগ। 'এক ঘণ্টা পর রওনা হচ্ছেন আপনি অ্যালবাকার্কিতে ঘণ্টাখানেক লাগবে আমাদের প্লেনে করে পৌঁছুতে।'

'আলী আহমেদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানা দরকার আমার।'

কোটের ভিতর থেকে একটা পাতলা ফাইল বের করল র‍্যাকারসন। 'এই যে, এখানে পাবেন। পড়ার পর পুড়িয়ে ফেলবেন। ছাইগুলোর প্লেনের কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দেবেন অ্যালবাকার্কিতে পৌঁছুনোর পর ডক্টরের হাঁটাচলা আর কথাবার্তার একটা টেপ দেখানো হবে আপনাকে। যতটা পারেন নিখুঁত ভাবে অনুকরণ করবেন, ব্যস। বাকিটা আমরা দেখব।'

ফাইলটা নিল রানা, তারপর বলল, 'ডক্টরের পরিচিতদের সবাইকে আমি বোকা বানাতে পারব তা কিন্তু সম্ভব নয়।'

ঘনঘন দু'তিনবার মাথা নাড়ল র‍্যাকারসন। 'আপনি মারাত্মক আহত। তারপরও কাজটা শেষ করার তাগিদে যাবেন ইন্সটলেশনে। ওখানে সব ঠিকমত চলছে কি না সেটা ঘুরে ঘুরে দেখবেন। কথা বলতে কষ্ট হয় আপনার, কাজেই ইচ্ছে না হলে মুখ খুলবেন না। ব্যান্ডেজ এমন ভাবে করা হবে যে আপনার কথা অস্পষ্ট শোনাবে। ও নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না, যদি না আপনি কোন মারাত্মক তথ্যগত ভুল করে বসেন।'

'আর তাঁর স্ত্রী? তাকে ফাঁকি দেব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। আমেরিকানরা ওকে কতটুকু বিশ্বাস করবে সেটা ওর পরিষ্কার জানা আছে। সম্ভবত সিআইএর প্রাক্তন এজেন্ট

মহিলাটিকে লাগিয়ে দেওয়া হবে ওর উপর সর্বক্ষণ নজর রাখতে।

হাসি-হাসি হয়ে গেল র‍্যাকারসনের বুলডগের মত ভোঁতা চেহারাটা, যতটা হওয়া সম্ভব। 'সামান্থা আমাদের এজেন্সিরই এজেন্ট ছিল। ও জানে ওর স্বামী মারা গেছে। আপনাকে সম্পূর্ণ সহায়তা দিতে কোন আপত্তি নেই তার।'

'দ্বিতীয় কামানটা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে?' রানা জানতে চাইছে লেযার সুইচ সরানো বা ধ্বংস করা ওর পক্ষে কতটা কঠিন হবে।

'অবশ্যই!' সামনে ঝুঁকে এল র‍্যাকারসন। 'বিশেষ করে লেযার সুইচটা। ওটা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ভল্টে রাখা হচ্ছে। শুধু টেস্টের সময় বের করা হবে। এনএসএ-র টপ এজেন্ট ওখানে সিকিউরিটি চীফ হিসেবে কাজ করছে। তার অধীনে তিরিশজন কমান্ডো সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে ক্যানন। আমরা কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না।'

দুই

'তারপর, সুপার স্পাই?' দরজাটা বন্ধ হতেই টিটকারির হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রানার দিকে তাকাল সামান্থা। 'এখন কী করতে হবে আমাকে...মিস্টার রানা?'

'প্রথম কাজ মিস্টার বাদ দেয়া,' বলল মমিকৃত, গম্ভীর রানা। 'দ্বিতীয় লেসন্, আমি ডক্টর আলী আহমেদ, অক্সফোর্ডের পিএইচডি, ফিযিসিস্ট। সুপার স্পাই বা রানা নই।'

'দুঃখিত, অ্যালি।' মহিলার গলায় রাগ প্রকাশ পেল। টেবিলের উপর রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল সে। রানা লক্ষ করল, সিগারেট ধরা হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

মহিলাকে সহজ হতে সাহায্য করা দরকার। খানিকটা নরম স্বরে বলল রানা, 'সামান্থা, আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে এটা সিআইএ-র প্ল্যান। এবং তোমার সম্মতিও আছে।'

'জানি।' রানার মুখোমুখি সোফায় বসে পড়ল মহিলা। 'আমাকে সবই জানানো হয়েছে। আমি রাজি হয়েছি শুধু দেশের স্বার্থে। কিন্তু ওরা আমার স্বামীকে কখনোই আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

সামান্থার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকাল রানা। ওর মনে হলো যেন ধকধক করে জ্বলছে মহিলার বাদামী চোখ দুটো। দক্ষ অভিনেত্রী, না সত্যিই আলী আহমেদকে ভালবাসত মেয়েটা? নিজেকে সতর্ক করে দিল রানা, এর উপর নজর রাখতে হবে। যদি সত্যিই আলী আহমেদকে ভালবেসে থাকে, তা হলে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট চুলোয় গেলেও হয়তো থামবে না এ। সোহেলের কথাগুলো মনে পড়ল। মহিলা ব্রেইন ড্রেইন প্রকল্পের কারণে আলী আহমেদকে বিয়ে করেছিল? মেজর জেনারেল রাহাত খানের কি এরকম একটা ব্যাপারে ভুল হতে পারে?

'বিশেষ কাউকে সন্দেহ হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। অ্যালি আমাকে তেমন কিছু বলত না। হয়তো পুরোপুরি ঝামেলামুক্ত রাখতে চাইত আমাকে। আমিও কখনও ওকে প্রজেক্টের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না।'

বারের কাছে চলে গেল রানা, লেমোনেড ঢেলে গ্লাসে চুমুক দিল। ডক্টর আলী আহমেদ মদ্যপান করতেন না, লেমোনেড তাঁর পছন্দের ড্রিঙ্ক ছিল।

চোখ সরু করে রানাকে দেখল সামান্থা। 'হোমওয়ার্ক ঠিক মতই তো করিয়েছে দেখছি।'

'স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে,' আবার মনে করিয়ে দিল রানা। 'বাড়ির ভিতরেও আমি অ্যালি, বাইরেও। এসব ব্যাপারে সামান্য ভুল হলেও চলবে না।' ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল রানা। ছোটখাট কয়েকটা বৈসাদৃশ্য ওর দৃষ্টি এড়াল না। ছবির ফ্রেমের উপর ধুলোর পুরুত্বের কমবেশি, ফোনের একটা স্ক্রুতে চকচকে ভাব, যন্ত্রটার বেযবোর্ডে আঁচড়ের দাগ। অপেশাদার কারও চোখে হয়তো পড়বে না, তবে দক্ষ চোখ ঠিকই বুঝবে বাড়িটা দু'একদিনের মধ্যে ছারপোকার খোঁজে সার্চ করা হয়েছে।

'চিন্তার কিছু নেই,' রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল সামান্থা। 'সিআইএর স্পেশাল টীম পরীক্ষা করে গেছে। আড়িপাতার যন্ত্রপাতি নেই। ওরা আরও কিছু একটা খুঁজেছে হন্যে হয়ে, সেটাও পায়নি।'

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সামান্থা, এমন সময় দরজায় ঠকঠক করে আওয়াজ হলো। টোকা দিচ্ছে কেউ। অথচ এখন কারও আসার কথা নয়। মাথা কাত করে নিঃশব্দে নির্দেশ দিল রানা, ওর হাত চলে গেছে শোল্ডার হোলস্টারের কাছে।

দরজা সামান্য ফাঁক করে রানাকে শুনিয়ে বলে উঠল সামান্থা, 'ডক্টর রিচার্ড! খুব খুশি হয়েছি আপনি সময় করে এসেছেন।' বলার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা গেল, কথাটা বিরক্ত বোধ করা সত্ত্বেও স্রেফ ভদ্রতা করে বলা। 'কিন্তু পরে এলে ভাল হয়, ডক্টর! অ্যালি মাত্র পৌঁছেছে। আমরা ভাবছিলাম...'

নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ আছে সামান্থার। কণ্ঠস্বরে পরিমিত বিরক্তি আর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রকাশ পেল। ওকে একশোতে একশো দিল রানা।

'আমি শুধু পাঁচটা মিনিট নেব, মিসেস আহমেদ.' সামান্থাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মাঝারি আকৃতির এক

মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁর ধূসর চুলগুলো এলোমেলো। 'দেখা করতে না এসে আর পারলাম না। ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম।'

'ডক্টর রিচার্ড,' দুর্বল স্বরে বলল রানা। 'আসুন। বসুন।' হাতের ইশারা করল ও সোফার দিকে। ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়লেন। রানা মনে মনে আশা করল ব্যান্ডেজের ভিতর থেকে বেরোনো ওর অস্পষ্ট কথাগুলো বেমানান লাগবে না। ডক্টর রিচার্ড হ্যান্সের ডোশিয়ে এখনও পড়ার সময় হয়ে ওঠেনি ওর। ও জানে, ইনিই এই প্রজেক্টের চিফ।

শুকনো একটা খকখকে হাসি দিলেন ডক্টর রিচার্ড। চেহারাটা দেখে মনে হলো মোটা একটা ভোঁদড়। 'আপনি নিশ্চই জানতে চাইবেন আমাদের কাজের কী অবস্থা? সবকিছু ঠিকঠাক আছে। অ্যাডাম আর আমি বড় টেস্টটার জন্যে প্রোগ্রামিং শুরু করে দিয়েছি। নিনাও খুব সাহায্য করছে। নতুন আসা সায়েন্টিস্টদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশি জানে ও। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন আপনি। কাজের কথা ভাববেনই না। আশা করি সেরে উঠতে সময় লাগবে না আপনার।'

কথা শেষে পুরু গোঁফের নীচে লালচে ঠোঁট জোড়া জিভ দিয়ে চাটলেন ভদ্রলোক, কৌতূহলী চোখে রানার দিকে তাকালেন। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছেন কতখানি আহত হয়েছেন আলী আহমেদ। বেফাঁস কিছু বলে বসলে সন্দেহ জাগতে পারে ভেবে লোকটার জ্বরের রোগীর মত চকচকে চোখের দিকে চেয়ে খানিক চুপ করে থাকল রানা, দ্বিতীয় লেথার সুইচটার কথা চকিতে খেলে গেল ওর মাথায়, ওটা ব্যবহার করলেই ভদ্রলোক জেনে যাবেন জিনিসটা আগেরটার মত সাধারণ নয়।

ক্লান্ত স্বরে বলল রানা, 'শুনে ভাল লাগছে যে আমার জন্যে কাজ আটকে নেই।'

'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, ডক্টর।' হাসলেন ডক্টর রিচার্ড হ্যান্স,

তারপর ইতস্তত করে বললেন, 'একটা ড্রিঙ্ক নেয়া যাবে? নেব?'

বারের দিকে ব্যান্ডেজ মোড়ানো হাত তুলল রানা। 'শিওর।'

লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখে ভিতরে ভিতরে নড়ে গেল রানা। মরুভূমির মাঝে পিপাসায় মৃতপ্রায় কাউকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি সাধলে সে-ও বোধহয় এতটা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত না। প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাচ্চা হরিণের চঞ্চলতায় বারের কাছে চলে গেলেন ডক্টর রিচার্ড, দ্রুত হাতে আধ গ্লাস বুরবঁ ঢেলে পানি না মিশিয়েই ঢকঢক করে গিলে নিলেন। ভয়ানক কড়া নির্জলা মদ তাঁর চেহারায় সামান্যতম বিকৃতি আনতে পারল না।

লোকটা অ্যালকোহলিক!

রানা তাঁকে লক্ষ করছে সেটা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে খেয়াল করেছেন ডক্টর রিচার্ড, তাঁকে মদ্যপ ভাবা হচ্ছে সেটাও আঁচ করতে পারলেন। আড়ষ্ট হয়ে গেল ভদ্রলোকের চেহারা। খুকখুক করে কেশে উঠে বললেন, 'যাক, ভাল, সুস্থ হয়ে উঠছেন আপনি, ডক্টর।'

'প্লিজ, ডক্টর রিচার্ড,' মাঝখান থেকে বলে উঠল সামান্থা। 'অ্যালি দুর্বল হয়ে পড়ছে। গতকাল পর্যন্ত ওকে আইভি দিয়েছেন ডাক্তাররা...' মিইয়ে গেল সামান্থার গলা, যেন মারাত্মক আহত স্বামীর কথা চিন্তা করতে গিয়ে কিছুটা বিহ্বল। রানা সেদিকে মনোযোগ দিল না, ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন ডক্টর রিচার্ড। বুঝতে পারছে, লোকটা ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

'ঠিক! ঠিক!' ঘনঘন মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর রিচার্ড। 'ঠিক আছে, ডক্টর, যাচ্ছি আমি। পরে দেখা হবে। আশা করি সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগবে না আপনার।'

সামান্থার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিছনে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলেন তিনি। সামান্থা ফিরে এসে সোফায় বসতেই রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ভুল করলাম? লোকটা জেনে গেছে আমি

ডক্টর আলী আহমেদ নই।'

'অন্তত সন্দেহ করেছে,' বলল সামান্থা। 'ভদ্রলোক ড্রিঙ্ক চাইতেই ওভাবে স্বাভাবিক আচরণ করা ঠিক হয়নি। উনি মদ খান বলে সাঙ্ঘাতিক বিরক্ত ছিল অ্যালি। রীতিমতো বিতৃষ্ণা ছিল ওর। সেধে ড্রিঙ্ক চাইলে অন্তত দু'চার কথা শুনিয়ে দিত ও।'

চুপ করে থাকল রানা। কে জানত এতো উঁচু পর্যায়ের দায়িত্বশীল একটা লোক পাঁড় অ্যালকোহলিক হতে পারে!

'উপর মহলের লোকদের মনের ওপর চাপ থাকে বেশি,' তিক্ত স্বরে বলল সামান্থা।

'কতদিন থেকে তোমার স্বামী চিনত ডক্টর রিচার্ডকে?'

'জানি না। মনে পড়ছে অ্যালি একবার বলেছিল, ডক্টর রিচার্ড বিরাট মাপের কেমিস্ট। মাল্টি-ন্যাশনাল একটা কোম্পানি থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে সরকারকে। প্রচুর বেতন পান, শুনেছি তারপরও ধার করে চলতে হয় তাঁকে। ভদ্রলোকের জুয়াতে ভীষণ নেশা। বদঅভ্যাসের কারণে বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

মদ, জুয়া, টাকার অভাব? মনের মধ্যে চিন্তাটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। টাকার জন্য নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন ডক্টর রিচার্ড? রাশিয়া বা গণচিনের কাছে বিক্রি হয়ে যাবেন? সম্ভাবনা কম। কিন্তু এটাও একটা সম্ভাবনা। ডক্টর আলী আহমেদের দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য কি ডক্টর রিচার্ড দায়ী?

'একটু পর বেরোব আমি,' সিদ্ধান্তে এসে বলল রানা। 'কেউ আমার খোঁজ করলে বলতে হবে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছি, ভূমিকম্প হলেও জাগব না।'

'খাওয়ার আগে বাইরে যাওয়া নয়।'

কিচেনে চলে গেল সামান্থা, ট্রে নিয়ে ফিরল একটু পর। দক্ষ হাতে টেবিল সাজাতে শুরু করল। চুপ করে মহিলাকে দেখছে রানা। কী চলছে সামান্থার মনের ভিতর? হাত আর মুখের

ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করল ও।

বাড়িটায় থমথমে একটা অস্বস্তিকর আড়ষ্ট পরিবেশ বিরাজ করছে।

খাওয়ার সময় অস্বস্তি কাটাতে দু'একটা কথা হলো দু'জনের, তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

বেশ কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে, আঁধার নেমেছে। একে মরুভূমি অঞ্চল, তার উপর এলাকাটা সমুদ্র-সমতল থেকে অনেক উঁচু, গরমকালেও সন্ধ্যার পরপরই দ্রুত কমে যায় তাপমাত্রা। ব্যান্ডেজহীন মুখে রাতের শীতল বাতাসের পরশে প্রশান্ত একটা অনুভূতি হলো রানার। পিছনের বেড়া টপকে রাস্তায় নামল ও। খানিকটা দূরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, এ ছাড়া চারপাশে সুনসান পরিবেশ। রাস্তায় একজন লোকও দেখতে পেল না। দু' ব্লক হাঁটতে হলো ওকে, তারপর নির্দিষ্ট জায়গাতেই পেল গাড়িটা। একটা তোবড়ানো চেহারার ঝরঝরে ফোর্ড পিকআপ জীপ বরাদ্দ করেছে ওকে সিআইএ।

এঞ্জিনটা স্টার্ট দেওয়ার পর রানার বিরক্তি কেটে গেল। বাইরে সদরঘাট, ভিতরে ফিটফাট। মৃদু গুঞ্জন করছে চমৎকার টিউন করা শক্তিশালী, আনকোরা নতুন ইঞ্জিন। প্রথম বাঁক নেওয়ার সময় টের পেল, চালকের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য গাড়ির চেসিসেও গোপন পরিবর্তন আনা হয়েছে।

গতি বাড়াল রানা, প্রায় নিঃশব্দে শহরের পশ এলাকার দিকে ছুটে চলল ওর জীপ। ওখানেই শহরের শেষ প্রান্তে ডক্টর রিচার্ডের বাড়ি। ঠিকানা জানা থাকায় খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। সুন্দর ছিমছাম একটা বাড়ি, পিছনে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। দেখলে মনে হয় বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

খানিকটা দূরে রাস্তার পাশে জীপ রেখে নামল রানা, সামনের বাগানের কাছে একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল। বাড়ির

ভিতর ঢুকবার আগের এই সতর্কতাটুকু ডক্টর রিচার্ডের সাথে ওর দেখা হয়ে যাওয়া ঠেকাল। লনের বাতির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, সদর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

ভোঁতা গর্জন ছেড়ে জ্যান্ত হলো ওটার এঞ্জিন। সোজা শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ছুটলেন বিজ্ঞানী। তাঁকে অনেকটা এগিয়ে যেতে দিয়ে পিছু নিল রানা। একটু পরই ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। প্রফেসর যেদিকে চলেছেন সেটা শহরের নোংরা একটা অংশ। জায়গাটা সস্তা বার, জুয়ার আড্ডা আর পতিতালয়ের জন্য কুখ্যাত।

প্রায় ধসে-পড়া চেহারার লম্বাটে একটা দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নামলেন ডক্টর রিচার্ড। ধুলোভরা পার্কিং লটে পুরোনো কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। ওগুলোর গায়ে ঠেস দিয়ে আছে কয়েকজন স্প্যানিশ পতিতা, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা করছে। তাদের পাশ কাটিয়ে একটা সাইডডোর দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন প্রফেসর। তাঁর ভঙ্গিই বলে দিল এখানে তিনি নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন।

এক ব্লক দূরে জীপ রেখে লম্বাটে বাড়িটার পিছনের রাস্তায় চলে এলো রানা। বারের পিছনে দুটো উঁচু জানালার নোংরা কাঁচ ভেদ করে আসছে হলদেটে উজ্জ্বল আলো। আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখে ছায়ায় মিশে এগোল রানা, একটা ভাঙা বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে কাছের জানালাটায় উঁকি দিল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শার্টের হাতা দিয়ে নোংরা কাঁচ মুছল। এবার খানিক স্পষ্ট হলো দৃশ্যটা।

সবুজ একটা ফেল্টটপ জুয়ার টেবিল ঘিরে বসে আছে দে কয়েকজন লোক। তাদের সামনে কার্ড, চিপস্ আর মদের গ্লাস। ডক্টর রিচার্ড দেরি না করে বসে পড়েছেন খেলায়। জুয়া খেলতে হলে চেহারায় নিস্পৃহ একটা ভাব ধরে রাখতে হয়, কিন্তু শুরুতেই তাঁকে বিচলিত আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। হাতে কেমন আছে তা

সেটা তাঁর চেহারাই প্রচার করছে। পরবর্তী দশ মিনিটে কয়েকশো ডলার হেরে গেলেন তিনি। জানালায় দাঁড়িয়েও রানা টের পেল, অন্য খেলোয়াড়রা নিশ্চিন্তে চুরি করতে পারবে। সম্ভবত করছেও। বিজ্ঞানীর পিছনের একটা ভাঙা আয়নায় তাঁর হাতের প্রত্যেকটা তাস দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ডিলার যেভাবে তাসের পেটি নাড়ছে তাতে রানার মনে দৃঢ় সন্দেহ জন্মাল, তাসগুলোয় কারিগরি ফলানো হয়েছে। সুপরিকল্পিত ভাবে ডক্টর রিচার্ডের পকেট ফাঁকা করছে লোকগুলো।

তবে কেউ চুরি না করলেও ফলাফল একই হত। ডক্টর এমনিতেই হারতেন তাঁর নিম্নমানের জঘন্য খেলার কারণে। ভদ্রলোক বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু পরিসংখ্যান সম্বন্ধে তাঁর ন্যূনতম ধারণাও নেই।

ভিতরের আওয়াজ বাইরে আসছে না, কিন্তু কী ঘটছে আন্দাজ করতে পারল রানা। ডক্টর রিচার্ড ফতুর হয়ে গেছেন, ধার চাইলেন। তাঁকে ধার দেওয়া হলো না। হোঁৎকা চেহারার এক মেক্সিকান ঠেলা দিয়ে ডক্টর রিচার্ডকে দেয়ালের গায়ে ফেলে দিল। কোমরে গোঁজা ধারাল ছোরা বের করল লোকটা। হলদে আলোয় চিকচিক করে উঠল ওটার ফলা। ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডক্টরের চেহারা, হড়বড় করে কী যেন বলতে শুরু করলেন। ভদ্রলোককে সাহায্য করতে ভিতরে যাবে কি না ভাবল রানা, সিদ্ধান্তে আসার আগেই দেখল, দক্ষ বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের মত ছোরাওয়ালাকে পাশ কাটিয়ে ছুটেছেন ডক্টর। প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মেক্সিকান লোকটা ধাওয়া না করে আবার চেয়ারে গিয়ে বসল।

আধ মিনিট পর বাড়ির সামনে থেকে ডক্টর রিচার্ডের গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার ভোঁতা গর্জন শুনতে পেল রানা। জুয়ার আড্ডার মালিককে নালিশ করতে যাননি ভদ্রলোক! নিঃশব্দে লাফ দিয়ে বাক্স থেকে নামল ও, দৌড়াতে শুরু করল দূরে রেখে আসা

গাড়ির দিকে। বারের সামনের অংশে পৌঁছে দেখতে পেল, বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে ডক্টরের গাড়ির টেইললাইট।

দু'মিনিট ঝড়ের বেগে জীপ ছুটিয়ে আবার টেইললাইট দুটো দেখতে পেল ও। ফ্রীওয়ের দিকে চলেছেন ডক্টর। তুমুল বেগে গাড়ি চালাচ্ছেন। দূরত্ব অনেকটা কমিয়ে আনল রানা। বেল কোথায় যাচ্ছেন ভদ্রলোক সে-সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা নেই। অনিশ্চয়তাটা ওকে সতর্ক করে তুলল।

ডক্টর রিচার্ড শহরের সীমানা পেরিয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর হাইওয়ে ছেড়ে বাঁক নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় পড়লেন। পথটা দু'পাশের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে, শেষ হয়েছে প্রকাণ্ড একটা দোতলা বাড়ির উঠানে। ওটার একটা জানালাতেও আলো জ্বলছে না। গাড়ি পার্ক করে বিনা দ্বিধায় বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন ডক্টর রিচার্ড।

একটা ঝোপের পিছনে জীপ রেখে অন্ধকারে বাড়িটার দিকে এগোল রানা। লনে ঝোপঝাড় ভরা। একটার পর একটা জানালায় সাবধানে উঁকি দিতে শুরু করল ও। পঞ্চম এবং শেষ জানালায় দেখা মিলল ডক্টরের। ঘরের ভিতর আলো নেই, তবু বাইরে থেকে ঢোকা সামান্য আভায় লোকটার মোটাসোটা অবয়ব চিনতে অসুবিধে হলো না। অস্থির পায়ে পায়চারি করছেন রিচার্ড।

'ঈশ্বর!' হঠাৎ বলে উঠলেন ডক্টর, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত এলে তুমি!'

আরেকটা অবয়ব হাজির হয়েছে ঘরের ভিতর দিকের দরজায়। একটা নাইট গ্লাস সঙ্গে থাকলে চেহারা দেখা যেত, ভাবল রানা। আরেকটা কথা, যে এসেছে সে ঈশ্বর হতে পারে না।

'এই যে, নাও।' ছায়ামূর্তি একটা খাম এগিয়ে দিল। অন্ধকারে ওটার ঝকঝকে সাদা রং পরিষ্কার বোঝা গেল।

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। সত্যি, তুমি জানো না আমার কী

উপকার করলে। তুমি তো জানো আমি...'

'বাদ দাও। এখানে টাকা যা আছে তাতে তোমার জুয়ার ধার শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু...'

আর শোনা হলো না রানার, শক্তিশালী একটা হাতের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে দেয়ালের উপর পড়ল ও। নীরবতার মাঝে থপাস করে আওয়াজ হলো। দেয়ালে বাড়িটা খেয়েই হাঁটু ভাঁজ করে ঘুরে একপাশে সরে গেল রানা। সেটাই ওকে বাঁচাল। খট করে আওয়াজ হলো। এক মুহূর্ত আগে ওর মাথা যেখানে ছিল তার পিছনের দেয়ালে দাঁত বসাল ধারাল হ্যাচেট।

এক ঝটকায় ওয়ালথার বের করে আনতে চেষ্টা করল ও; কিন্তু সময় পেল না, তার আগেই পাঁজরে শক্ত জুতো পরা পায়ের জোর লাথি খেল। চোখের সামনে হরেক রঙা তারা দেখতে পেল রানা। ব্যথায় মনে হলো অন্তত একটা হাড় ভেঙেছে। শরীর শিথিল করে দিল ও, বসে পড়তে পড়তে অভ্যেস বশে ডানহাতের খাপ থেকে স্প্রিংলোডেড স্টিলেটো বের করে আনল। আক্রমণকারী এগিয়ে আসছে। আওতার মধ্যে পেতেই খোঁচা দিল রানা। মাংসে দাঁত বসাল স্টিলেটোর চোখা ডগা, খচ করে ঢুকে গেল গভীরে। ছিটকে বেরোনো রক্তে ভিজে গেল রানার হাত।

'উহ্!'

ব্যস, ওই একটা শব্দই বের হলো লোকটার মুখ থেকে, ব্যথা যেন কিছুই নয়। পিছিয়ে গিয়েছিল লোকটা, ওকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ না দিয়ে স্টিলেটো এড়িয়ে এগিয়ে এলো আবার।

বসে থাকা অবস্থায় সুবিধা করতে পারবে না বুঝে মাটিতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিল রানা। ওর মাথার পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল লোকটার লাথি। আরও কয়েক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। কুঁজো হয়ে দক্ষ ছোরাবাজের মতো স্টিলেটো বাগিয়ে ধরল। সামনে কেউ নেই। আততায়ী দেয়ালে গাঁথা হ্যাচেট ফেলেই সরে চলে গেছে। পাশের বারান্দায় অস্পষ্ট পায়ের

আওয়াজ পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। লোকটা ছুটছে
খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। ধাওয়া করল
দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। লাথি মেরে প
এক পাশে সরে গেল ও। ভিতর থেকে গুলি করল ন
এবার সাবধানে ঘরে ঢুকল রানা। খালি বাড়ির ভিতর
হচ্ছে সজোরে দরজা খোলার আওয়াজ। ঘরের ভিত
কালো অন্ধকার। নিঃশব্দে এক পাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁ
কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল সামান্যতম শব্দ। মেঝের
জুতোর খসখস, দেয়ালের রুক্ষ প্লাস্টারে শার্টের ঘষা
জোরে শ্বাস নেওয়া—কোন আওয়াজ নেই।

আধমিনিট পেরিয়ে গেল। অন্ধকারে চোখ অনেকট
এসেছে ওর। খুট করে একটা আওয়াজ হলো সিঁড়ির উল্টো
পা টিপে টিপে সরতে শুরু করল রানা, পরক্ষণেই কাঁধ আর
ভারী ওজন আর জোর ধাক্কায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝে
সিঁড়ির উপর থেকে ওর কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অপেক্ষারত
খুনি। আচমকা বেকায়দা ভাবে মেঝেতে পড়ে ফুসফুস
বাতাস বেরিয়ে গেছে রানার, পাঁজরের ব্যথাটা তীব্র হয়ে উ
আচ্ছন্নতা ওকে গ্রাস করছে। মাথার পাশে প্রচণ্ড একটা
খেল। শরীরটা অবশ হয়ে গেল আরও। আঁধার নেমে অ
চোখে, কেমন ঝিমঝিমে একটা অলস অনুভূতি। সচেতন
রাখতে চেষ্টা করল। পারছে না। মনে হলো যেন শেষ হয়ে য
সব।

মনের ভিতর কে যেন গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, হাল ছেড়ো
রানা!

কার গলা?

কাঁচাপাকা একজোড়া ভুরুর কথা মনে এলো। হঠাৎ কোথে
যেন খানিকটা শক্তি ফিরে পেল রানা। আবছা ভাবে লোক
আকৃতি দেখতে পেয়ে স্টিলেটো ধরা ডান হাত চালাল। অ

একটা জান্তব আওয়াজ শুনল। পিছাতে চেষ্টা করছে লোকটা। হাতটা টেনে নিয়ে আবার খোঁচা দিল ও, একই সঙ্গে লাথি মারল হাঁটু লক্ষ্য করে। হাড়ের উপর শক্ত সোলের লাথি পড়ায় খট্ করে আওয়াজ হলো। স্টিলেটোটাও মাংসের ভিতর অনেকদূর ঢুকে গেছে। পিচকারির মতো ছিটকে বের হলো আঁশটে গন্ধময় তাজা রক্ত।

লোকটা টলতে টলতে পিছাল, রানা উঠে বসবার আগেই চিত হয়ে ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। উঠে দাঁড়াল রানা, কষে একটা লাথি মারল লোকটার পাঁজরে। বিদঘুটে একটা আওয়াজ করল আততায়ী, যেন গড়গড়া টানছে।

অসুস্থকর আওয়াজটা রানার পরিচিত। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। তবু সতর্কতায় ঢিল না দিয়েই লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও।

'কে ডক্টর রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

জবাবে খাবি খাওয়া মাছের মত হাঁ করল লোকটা, কালো রক্তে ভেসে গেল থুতনি। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল।

আবার প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না রানা। একে প্রশ্ন করে লাভ নেই, কারও কথার আর জবাব দেবে না লোকটা।

লাশের পকেট সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। মানিব্যাগও নেই। জামাকাপড় থেকেও প্রস্তুতকারকের নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। লোকটা চাইনিজ। একে আগে কখনও দেখেনি ও।

পরবর্তী আধঘণ্টা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পুরো বাড়ি সার্চ করল রানা। কারও দেখা মিলল না। যেসব ঘরের জানালার কাঁচ ভাঙা সেগুলোর দেয়ালে ধুলো-ময়লার দাগ। কয়েকটা পুরোনো আসবাবপত্র আছে, তবে অবস্থা করুণ। মনে হলো না এ-বাড়িতে বছর খানেকের ভিতর কেউ বসবাস করেছে। জায়গাটাকে গোপনে দেখা করার জন্য ব্যবহার করেছে ডক্টর রিচার্ড আর সেই

রহস্যময় আগন্তুক।

বেরিয়ে এলো রানা, চারপাশে একপাক দেওয়ার পর বুঝ
পারল দ্বিতীয় লোকটা কোথায় তার গাড়ি রেখেছিল। চলে গ
সে। ডক্টর রিচার্ডও নেই। আততায়ীর গাড়িটা পেল ওর ডা
পাশে, আরেকটা ঝোপের পিছনে। সার্চ করল রানা, এ
পরিচয়সূচক কিছু পাওয়া গেল না। তিক্ত একটা অনুভূতি
ওর। শত্রুপক্ষ ওর পরিচয় জানে, ও যখন ডক্টর রিচা
অনুসরণ করতে ব্যস্ত, তখন ওর অজান্তে পিছু নিয়েছে তা
লোক। অথচ এখনও প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনের রি
এরিয়াতেই ঢোকা হয়ে ওঠেনি ওর।

এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ডক্টর আ
আহমেদের বাড়ির দিকে ফিরতি পথ ধরল হতাশ রানা।

বাড়ি ফিরে দেখল শুয়ে পড়েছে সামান্থা। শোবার ঘ
দরজা খোলা। ঘরটা অন্ধকার। সিআইএর ব্রিফিং অনুযায়ী র
তার সঙ্গে শোবে। মহিলার সেটা জানা থাকার কথা। সে-কার
দরজা বন্ধ করেনি।

সদ্য-বিধবা মহিলার পাশে শুতে মনের সায় পেল না রানা
একটা বালিশ এনে সোফায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়তে সম
লাগল না।

তিন

ব্যান্ডেজের কারণে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। গাড়ির সামনের সিটে চুপ
করে বসে আছে রানা সামান্থার পাশে। রাস্তার দু'পাশে একঘেয়ে

দৃশ্য। এখানে ওখানে জন্মেছে মেসকিট, এছাড়া ধূসরের বুকে সবুজের প্রতিনিধিত্ব করছে দু'একটা সল্ট সাইডার এবং সাইপ্রেস। বালির টিবিগুলো ছেয়ে আছে টাম্বলউইডে। সূর্যের আলো এত প্রখর যে কালো সানগ্লাস পরেও চোখ কুঁচকে আছে রানা। দূরে দেখতে পেল ল্যাবোরেটরির গেট, তাপপ্রবাহের কারণে থরথর করে কাঁপছে বলে মনে হয়।

'সিকিউরিটি সম্বন্ধে বলো,' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল সামান্থার। 'তোমার তো আমার চেয়ে কম জানার কথা না!'

'তবু বলো।'

'তিন-চার দফা চেকিং হয়। কীভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে সেটা সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন স্থির করে। হ্যান্ডরাইটিং টেস্ট, সিকিউরিটি পাস চেক, ভয়েসপ্রিন্ট আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখা হয়। আমি বেয়ের, আরেকদিকে ডিআইএ অফিসে কাজ করি। ওখানেও একই ভাবে সিকিউরিটি চেক করা হয়। সিকিউরিটি পাস চেক করা হবেই। বাকিগুলো মাঝে মাঝে বাদ পড়ে। তবে সিকিউরিটি ব্যাজের ফটোগ্রাফের সঙ্গে যেহেতু চেহারা মেলাবার উপায় নেই, কাজেই তোমার ক্ষেত্রে কোন টেস্টই বাদ দেয়া হবে বলে মনে হয় না।'

'গেটের গার্ড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে?'

'না।'

পার্কিং লটে গাড়িটা থামতেই পকেট থেকে সিকিউরিটি ব্যাজ বের করে নামল রানা। সামনেই গার্ডের পোস্ট। কাঁধে একে ফোরটিসেভেন ঝুলিয়ে গোমড়া চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। তার হাতে ব্যাজটা ধরিয়ে দিল ও। গাড়ির আওয়াজে বুঝল, সামান্থা নিজের অফিসে যাচ্ছে।

'ডক্টর আহমেদ?' ভ্রূ কুঁচকে ব্যান্ডেজ মোড়া রানাকে দেখল

গার্ড।

'হুঁ।'

'ফুল সিকিউরিটি চেক হবে। আমার সঙ্গে আসুন।'

গার্ডের খুপরির ভিতর ঢুকল রানা লোকটার পিছু পিছু। এন... এনকোডিং মেশিনে ব্যাজটা ঢোকাল গার্ড। কম্পিউটার চেক ক... দেখছে জিনিসটা নকল কি না। আধ সেকেন্ড পর কন্সোলে স... বাতি জ্বলে উঠল। গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'ব্যাজ ঠি... আছে, তবে আমি আপনার চেহারার সঙ্গে ছবি মিলিয়ে দেখ... পারছি না। এটা যে-কেউ চুরি করতে পারে। হ্যান্ডরাইটিং... একটা ধাতুর পাত দেখাল লোকটা। ওটার পাশেই ইলেকট্রনি... লাইট-পেন্সিল পড়ে আছে।

নির্দ্বিধায় পেন্সিলটা তুলে নিয়ে সই করল রানা। হাতের লেখ... পরীক্ষা করতে শুরু করল কম্পিউটার। ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে সময়। অপেক্ষারত রানার মনে হলো, সিআইএ হয়তো ডক্টর আলী আহমেদের হাতের লেখার বদলে ওর হাতের লেখ... সিকিউরিটি কম্পিউটারে রাখতে পারেনি। দু'মিনিট পর 'ওকে' সিগনাল দিল যন্ত্রটা।

'ভয়েসপ্রিন্ট।' মাইক্রোফোন দেখাল গার্ড।

বলে গেল রানা, 'দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ... লেযি ডগ'স ব্যাক।'

সবুজ বাতি জ্বলে উঠল কন্সোলে।

'এবার বোধহয় আমার আঙুলের ছাপ চাইবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। ব্যান্ডেজ মোড়ানো হাত দেখাল। 'মাত্র তিনটে আঙুল অক্ষত আছে।'

'ওগুলো প্লেটের ওপর রাখুন।'

নির্দেশ পালন করল রানা। আবার সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। এবার সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'আমি সত্যি দুঃখিত, ডক্টর আহমেদ। কিন্তু বোঝেনই তো, দুর্ঘটনার পর সিকিউরিটি কড়া

'একটু তেইশ নম্বর বিল্ডিঙে যোগাযোগ করবেন?' ক্লান্ত গলায় বলল রানা। 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দরকার। শরীরটা ভাল লাগছে না। এই রোদের ভিতর এতোটা পথ হাঁটতে পারব না। ও এসে আমাকে নিয়ে গেলে ভাল হয়।'

এতটা পথ মানে বড়জোর একশো গজ, তবে গার্ড যোগাযোগ করল। পাঁচ মিনিট পর রানা দেখতে পেল মেয়েটাকে। পরনে সাদা ল্যাবকোট, ইন কম্পাউন্ড ইলেকট্রিক কার্ট চালিয়ে আসছে।

'মিস্টার আহমেদ,' কার্ট থেকে নেমে বলল নিনা হাডসন, 'আমি ভাবিনি আপনি আসবেন। আপনার তো বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'বিশ্রাম?' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল রানা। 'অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আসুন তা হলে।'

সাবধানে কার্টে উঠে বসল রানা। অস্বস্তি কাটাতে নীরবতা ভাঙল। 'কাজের কী অবস্থা? কিছু উদ্ধার করা গেছে বাঙ্কার থেকে?'

'সামান্য। লেযার ক্যাননটা পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা আর ঠিক করা যাবে না। ব্যাকআপ ইউনিটটা বিরাশি নম্বর বাঙ্কারে রাখা হয়েছে। ডক্টর রিচার্ড আর অ্যাডাম ওটার ওপর কাজ শুরু করেছেন।'

'আর টেস্ট রেযাল্ট?'

'সাকসেসফুল। টোটাল সাকসেস।'

'গুড।' আর কিছু বলা উচিত হবে কি না ভাবল রানা। নিনা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারে, কিন্তু ওর চেয়ে ফিযিক্স ঢের বেশি জানে।

'ওই দেখুন,' বলে উঠল নিনা। 'ডক্টর রিচার্ড আর অ্যাডাম ফিরে এসেছেন। ওঁদের সঙ্গে আপনি নতুন ইন্সটলেশনের ব্যাপারে

আলাপ করতে পারবেন।'

'আগে আমার ল্যাবে যেতে চাই,' বলল রানা। ল্যাবে কী পাওয়া যাবে তা ওর জানা নেই, তবে জানতেই ওর এখানে আসা। বিরাশি নম্বর বাঙ্কারে গিয়ে লেযার সুইচটা সরাতে হলে রিসার্চ এরিয়ার একটা ম্যাপ দরকার। চিন্তাটা মাথায় আসতে ডগলাস র‍্যাকারসনের কথা মনে পড়ে গেল। তিরিশজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে বিরাশি নম্বর বাঙ্কার। আলী আহমেদ হিসাবে যদি ঢুকতেও পারে ওখানে, লেযার সুইচ সরাবে কী করে? জিনিসটা ধ্বংস করতে পারবে হয়তো ও, কিন্তু সেখান কম্পাউন্ড থেকে আর জীবিত বের হতে হবে না। সমস্যা আপাতত ভুলে যেতে চেষ্টা করল ও। বুঝতে পারছে, জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে লেযার সুইচটার একটা ব্যবস্থা করতে হলে।

'ল্যাবেই চলুন তা হলে,' একটু দ্বিধা করল নিনা। 'একটা কথা, ডক্টর, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আপনি যেন নিজের মধ্যে নেই।'

'মনে হবে কী করে!' বিরক্তির ভঙ্গি নিল রানা। মহিলা এ প্রসঙ্গে আরও চিন্তা করুক তা চাইছে না। 'আরেকটু হলে পুড়ে মারা যেতাম আমি। সারাজীবনের জন্যে শরীরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।'

ভোঁতা শোনাল নিনার কণ্ঠস্বর, 'দুঃখিত, ডক্টর, এ-ব্যাপারে কথা বলা আমার ঠিক হয়নি।'

চুপ করে থাকল রানা, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এক মিনিট পর তেইশ নম্বর দালানের সামনে থামল কার্ট। ওটার রিচার্জিং প্লাগ সকেটে ঢুকিয়ে নামল নিনা। বলল, 'ফ্রেইট এলিভেটরে করে উঠলেই তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'

রানার নড়বার ভঙ্গিতে মনে হলো কষ্ট হচ্ছে। নিনার পিছু নিল ও। মালামাল তুলবার এলিভেটরে করে চতুর্থ তলায় উঠে এল ওরা। ডানদিকে যাচ্ছে নিনা, আবার নিনার পিছু পিছু হাঁটতে ওর

করল রানা।

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ল্যাবে যাবেন,' ভ্রূ কুঁচকে বলল নিনা। রানা বুঝতে পারল, ভুল করে ফেলেছে। ল্যাবটা বামদিকে। বিল্ডিঙের লেআউট সম্বন্ধে রাফ একটা স্কেচ দেওয়া হয়েছিল ওকে, তবে তাতে ফ্রেইট এলিভেটর আঁকা হয়নি। ঠিক তলাতেই এসেছে ও, কিন্তু কোথায় কোন্দিকে যেতে হবে তা জানে না।

টলে উঠল রানা। 'মাথাটা যেন কেমন করছে! মনে হচ্ছে পড়ে যাব।'

দ্রুত রানার কাঁধ জড়িয়ে ধরল উদ্বিগ্ন নিনা। 'কফি দেব? বা আর কিছু?'

'না। ধন্যবাদ।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'তুমি যাও। এক ঘণ্টা পর যোগাযোগ কোরো। আমি বরং আমার কাজগুলো সেরে নিই।'

মাথা ঝাঁকাল নিনা। কয়েকটা সোনালী চুল এসে পড়ল কপালে। ওগুলো সরিয়ে অনিশ্চিত হাসল মেয়েটা, তারপর চলে গেল।

ল্যাবে ঢুকল রানা। দামি দামি জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে ঘরটাতে। ইলেকট্রনিক পার্টস, শোল্ডারিং গান আর ভাঙাচোরা টুকরোটাকরা পড়ে আছে একটা বেঞ্চের উপর। পাতলা অস্বচ্ছ প্লাস্টিকের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা পাশের ঘরটায় চলে এল ও। এখানেই বসতেন ডক্টর আলী আহমেদ।

ধূসর গানমেটাল ডেস্কের পিছনে চেয়ারে বসে সেন্টার ড্রয়ারটা খুলল রানা। ভিতরে দুটো ল্যাব বুক ওর নজর কাড়ল। ওগুলোতে বৈজ্ঞানিক জটিল সব চিহ্ন ভরা। উপরে লেখা আছে: নন ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন্স ওনলি। ল্যাব বুক রেখে দিয়ে ড্রয়ারটা সার্চ করতে শুরু করল রানা। জেনারেটরের আওয়াজের উপর দিয়ে মানুষের গলা শুনতে পেল। প্লাস্টিকের দেয়ালের সরু

ফাঁকে চোখ রাখল ও। নিনা হাডসনকে দেখতে পেল, একজন লোকের দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

যেভাবে দু'জন পরস্পরকে জাপ্টে ধরে চুমু খাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সম্পর্কটা গভীর। অনিচ্ছুক চেহারায় নিজেকে সরিয়ে নিল নিনা, আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে নয়, অ্যাডাম, এখন না, কেমন? অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'প্লিজ, নিনা, বড় একা লাগছে।' আবার নিনাকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা। চুমু খেল। ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল, চিনতে পারল তাকে রানা।

'এখানে নয়,' আপত্তির সুরে বলল নিনা। 'গার্ডরা যদি দেখে ফেলে?'

'সিকিউরিটি ব্যাজ পরে থাকব,' হাসল বিজ্ঞানী। 'কিচ্ছু বলার নেই ওদের।' হাত ধরে নিনাকে টেনে নিয়ে চলল। 'প্লিজ, নিনা, ফটো ডার্করুমে চলো, দরজা বন্ধ থাকলে কেউ আসবে না, ভাববে ভিতরে কাজ করছি আমরা। দেখা যাক আমরা কী ডেভেলপ করতে পারি!'

চলে যাচ্ছে দু'জন। আরেকটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় সতর্কতাসূচক লাল বাতি জ্বলে উঠল।

ড্রয়ার সার্চ করে ম্যাপ পাওয়া গেল না। এমন কিছু নেই যা রানার কাজে লাগতে পারে। কী করবে ভাবল রানা। ঠিক করল, আপাতত পোড়া বাঙ্কার দেখতে যাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই। জানা নেই কে ডক্টর আলী আহমেদের হত্যাকারী। জানাটা ওর অ্যাসাইনমেন্ট নয়, তবে খুনিকে পেলে ছাড়বে না ও। বেরিয়ে যেতে হলে এখনই মোক্ষম সময়, নিজেদের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে নিনা হাডসন আর ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল।

*

ইন কম্পাউন্ড কার পুল থেকে কার্ট সংগ্রহ করতে ঝামেলায় পড়তে হলো না ওকে। সিকিউরিটি মেযার মেইন গেটের চেয়ে

অনেক কম। নতুন যোগ হলো শুধু স্পেশাল সরকারী ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখানো। আলী আহমেদের নামে একটা লাইসেন্স দিয়েছে ওকে সিআইএ, ওটাতে ওর আঙুলের ছাপও আছে।

দ্বিতীয় কাজ বাঙ্কারে যাওয়া। ওটাও খুব কঠিন হলো না। রানা যখন বাঙ্কারের কাছে পৌঁছুল ততক্ষণে ব্যান্ডেজ আর তুলোয় মিহি ধুলো আটকে আস্ত একটা ধূসর কাঠামো হয়ে গেছে ও। শ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে ধুলো, দাঁতের ফাঁকে কিচকিচ করছে।

বাঙ্কারটা দেখে মনে হয় ওটার উপর ভারী বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। কংক্রিটের দেয়ালে আগুনের হলকার কালো কালো দাগ। কুঁকড়ে গেছে দেয়াল। দরজা আর ওটার ধাতব হাতল, দুটোই কুঁচকে বিদঘুটে আকৃতি নিয়েছে। আলী আহমেদ মারা যাবেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মাথায় আঘাত করায় তাড়াতাড়ি এসেছে মৃত্যু, খুব বেশি যন্ত্রণা সইতে হয়নি তাঁকে।

দরজার হাতল ধরে টান দিল রানা। কজাগুলো একসময় মসৃণ ভাবে খুলে যেত, কিন্তু সেটা লেযার বিস্ফোরণের আগের কথা। দরজা সামান্য নাড়াতেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হলো ওকে। বিটকেল কাতর আওয়াজ করে এক ইঞ্চি খুলে গেল দরজা। পরক্ষণেই আচমকা খুলল আরও খানিকটা। হোঁচট খেয়ে কোনমতে ভারসাম্য রক্ষা করল রানা, তবে ওর হাতের ব্যান্ডেজ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। দরজা পুরোটা খুলে ভিতরে ঢুকল ও। বদ্ধ পরিবেশে পোড়া ইনসুলিনের দম আটকানো গন্ধ।

ভিতরটা অন্ধকার, সানগ্লাস খুলার পরও আবছায়ায় চোখ সইয়ে নিতে কয়েক মিনিট লেগে গেল ওর। এবার ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে মনোযোগ দিল ও। দামি দামি যন্ত্রপাতিগুলোর যে দুরবস্থা হয়েছে সেটা শক্তিশালী আগ্নেয় বোমা বিস্ফোরণেও হতো বলে মনে হয় না। স্রেফ মূল্যহীন জঞ্জালে পরিণত হয়েছে সব। জায়গায় জায়গায় গলে গেছে কেসিং, বেরিয়ে এসেছে

ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। সবুজ সার্কিটগুলো পুড়ে গলে গিয়ে প্লাস্টিক আর সিলিকনে রূপান্তরিত হয়েছে।

ধুলো-ময়লার ভিতর দিয়ে এগোতে গিয়ে ও খেয়াল এমন কিছু নেই যেটা প্রচণ্ড তাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি আহমেদের খুনি যদি কোন চিহ্ন রেখেও যেত, সেসব আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা। লেযারের মোটা টিউবটা গিয়ে দাঁড়াল রানা, জিনিসটার ঠাণ্ডা ধাতবে হাত বুলিয়ে ভাবতে বিস্ময় হয় যে এই আটফুটি যন্ত্রটা দু'হাজার মাইল যে-কোন কিছু ধ্বংস করে দিতে সক্ষম ছিল। জিনিসটা ধাক্কা দিল রানা, টিউবটা ঘুরে যেতেই তাকাল ওটার দিকে। তলার বল্টুগুলো খুলে নেওয়া হয়েছে। দুটো ও। ওগুলোর থ্রেডগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তার বিচ্ছুরণের আগেই খোলা হয়েছিল ওগুলো।

রানা আন্দাজ করল, ডক্টর আলী আহমেদ কাউকে বল্টু খুলবার সময় দেখে ফেলেছিলেন। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর করছিল লোকটা? পরীক্ষা অসফল করতে চেষ্টা করছিল, লেযার সুইচটা সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? যা-ই ক দু'জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পরিণতিতে ডক্টর আলীর গুঁড়িয়ে দেয় আক্রমণকারী। তারপর খুনের প্রমাণ লুকা হয়তো লেযার বিস্ফোরণ ঘটায়।

কে এসেছিল এই বাঙ্কারে? ডক্টর রিচার্ড হ্যান্স? সে-সম্ভা বেশি। অ্যালকোহলিক একজন লোক, জুয়ার ঋণে ডুবে এ গোপনে রহস্যময় কারও সঙ্গে দেখা করছেন। তাঁর পিছু দেখা গেছে তাকেও অনুসরণ করা হয়। আরেকটু হলেই খুন হ যেত ও। সবকিছুই ডক্টর রিচার্ডের দিকেই তর্জনী নির্দেশ কর কিন্তু প্রমাণ?

চারপাশটা ঘুরে দেখতে শুরু করল রানা।

ওদিকে নিনা আর ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল প্রেম করছে। দু'জনে

কেউই বিবাহিত নয়। নিনা আকর্ষণীয়া যুবতী, আর ডক্টর ব্রিল সুদর্শন, মিষ্টভাষী সুপুরুষ লোক। দু'জনের দু'জনকে ভাল লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। এর মধ্যে রহস্যময় কিছু নেই। তবে এতে করে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না তাদের কাউকে কোনভাবে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে না। কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গিতে মনে হয়েছে পরস্পরের প্রতি আগ্রহ লুকানোর কোন চেষ্টা নেই।

ফিরে যাবার কথা ভাবল রানা। কে স্যাবোটাজ করেছে সেটা এখানে খুঁজে জানার উপায় নেই। দরজার দিকে পা বাড়িয়েও কাঁকরের উপর গাড়ির চাকার শব্দে থেমে গেল রানা।

আওয়াজটা আর নেই।

দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করেছে!

এবার ভারী হুড়কো আটকানোর ধাতব শব্দটা শুনতে পেল ও। বন্ধ বাঙ্কারের ভিতর আওয়াজটা বারকয়েক প্রতিধ্বনিত হলো।

দ্রুত পা বাড়াল রানা, দরজায় ঠেলা দিল। একচুল নড়ল না পুরু স্টিলের দরজা।

স্পষ্ট বুঝল রানা, আটকা পড়ে গেছে ও।

চার

আবার দরজায় ধাক্কা দিল রানা। কাজ হলো না। এবার কাঁধ ঠেকিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি খাটাল। লাভের মধ্যে লাভ হলো কাঁধের হাড়ে ব্যথা পাওয়া। লেথারের কারণে বাঙ্কারের ক্ষতি

হয়েছে, কিন্তু স্টিলের দরজাটা এখনও যে-কোন ভ্
ভল্টের দরজার মতোই নিরেট।

দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে রানা। বা
দেওয়ার সময়েই দেখেছে বের হবার আর কোন পথ
ওকে আটকেছে তারা নিশ্চয়ই খাতির করার জন্য করে
একটা সময় লেখার প্রক্ষেপণের জন্য ছাদে যে ফাঁক
দিয়ে বের হওয়া যেত, কিন্তু এখন দেয়াল গলে গিয়ে
বন্ধ হয়ে গেছে। ও-পথে বের হওয়া অসম্ভব।

বাইরে একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল ও। দর
ঠেকাতেই অস্ফুট আওয়াজটা আগের চেয়ে স্পষ্ট হলো।

'চার্জ বসানো শেষ করো।'

'দারুণ লাগে আমার বিস্ফোরণ দেখতে,' আমেরিকা
সুরে আহ্লাদী গলায় বলল আরেকজন। 'প্লাঞ্জারটা আমা
দিতে দেবে, পিট?'

বলে কী শালা! মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তার ঝড় উঠল রানার।

বাইরে তর্কাতর্কি অনুরোধ-উপরোধ চলছে কে বাঙ্কার

আর সময় নষ্ট করল না রানা। হাতে সময় নেই
চারপাশে তাকাল ও, বের হবার পথ খুঁজছে ওর ব্যগ্র দৃ
বাইরের লোক দু'জন সিদ্ধান্তে এলেই ওর সাধের প্রাণ
ফুৎকারে শেষ হয়ে যাবে। বেযে বিস্ফোরকের কোন অভাব
এই বাঙ্কারে আসার পথে অন্তত দশটা স্টোরেজ-বাঙ্কার
ও, সতর্কতাসূচক সাইনবোর্ড পড়েছে। ওগুলোয় ডেটোনেট
আর লজেন্স আকৃতির হাই এক্সপ্লোসিভ পি-৪০ গুদাম কর
হয়েছে। ওরকম কয়েকটা লজেন্সে যদি ডেটোনেটর
লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তা হলে এরকম একটা
বাঙ্কারও নিমেষে ধুলোয় মিশে যাবে।

বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। দ্রুত!

দরজার হাতল ধরে সজোরে মোচড়ানোর চেষ্টা করল

হ্যান্ডেল নড়ছে না, সম্ভবত ওটার নীচে লম্বা একটা লোহার রড আটকানো হয়েছে। রডটার আরেক মাথা নিশ্চয়ই মাটিতে ঠেকে আছে। কী করবে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে চেষ্টা করল রানা। জানা নেই হাতে আর কতটা সময় আছে। হয়তো বড়জোর আর আধমিনিট।

ব্যান্ডেজ মোড়া ডান হাতে কপালের ঘাম মুছল রানা। ঠিক তখনই চিন্তাটা মাথায় এল। ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করল ও হাত আর মুখ থেকে। কাজটা শেষ হতে পনেরো ফুট গজ-ফিতে পাওয়া গেল। এবার বাঙ্কারের দেয়াল থেকে একটা রডের টুকরো খসিয়ে নিল ও, জিনিসটাকে বাঁকিয়ে ব্যান্ডেজের ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। বিরাট একটা বড়শির মতো রডটাকে ব্যবহার করতে চাইছে। মাছের বদলে দরজার হাতলে আটকানো হুড়কোটা ওর লক্ষ্য। ওটা সরাতে পারলে হয়তো বেঁচে যাবে ও।

একটা বাক্স টেনে এনে ওটার উপর দাঁড়াল রানা। দরজার উপরের পোড়া কংক্রিটের দুর্বল অংশে খোঁচাতে শুরু করল রডটা দিয়ে। আধমিনিটও লাগল না, ঝুরঝুর করে কংক্রিট ঝরে পড়তে শুরু করল। দেয়ালটায় খুদে একটা গর্ত তৈরি হলো আরও কিছুক্ষণ পর। ওটা দিয়ে বাইরের তপ্ত মরুভূমির কম্পিত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

ফুটো দিয়ে বাঁকা রডটা সাবধানে বের করে দিল ও, আস্তে আস্তে ব্যান্ডেজ ছাড়ছে। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে আছে ওর, একমনে ভাবতে চেষ্টা করছে, বাঙ্কার উড়াতে আসা লোক দুটো দরজার কাছে নেই। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে ওর। ব্যান্ডেজ ছেড়ে আর টেনে হুকের মতো রডটায় হুড়কোটা বাধাতে চেষ্টা করছে। কর্কশ কংক্রিটের কারণে ছিঁড়তে শুরু করেছে ব্যান্ডেজের ফিতে। রডটা টেনে নিল ও, নতুন করে ফিতে এমন ভাবে বাঁধল যাতে ওটার শক্ত জায়গাটা কংক্রিটের উপর থাকে। আবার রড বের করে দিয়ে ফিতে আগুপিছু করতে শুরু করল।

এতক্ষণে বোধহয় চার্জ বসানো শেষ হয়ে গেছে। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের লাফঝাঁপ স্পষ্ট টের পাচ্ছে রানা। মনে হচ্ছে ওটা বুকের খাঁচা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। রডটা দরজার হাতলে ঠেক দেওয়া দণ্ডটায় আটকাতেই অজান্তে শ্বাস আটকে গেল ওর। আস্তে আস্তে ব্যান্ডেজ টানতে শুরু করল। ক্রমেই জোর বাড়াচ্ছে।

ফিতেটা ছিঁড়ে যাবে না তো?

ঠন্ করে একটা আওয়াজ হলো। হাতলের তলা থেকে খসে গেছে দণ্ডটা। দেরি না করে প্রচণ্ড এক লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রানা, পরক্ষণেই তীরের মতো ছুটে বের হলো বাঙ্কারের ভিতর থেকে। ঝাঁঝাঁ রোদে দগ্ধ হচ্ছে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমি ছুটার ফাঁকে ঘাড় ফেরাল ও। দক্ষ হাতে বাঙ্কারের দেয়ালের নীচের দিকে সাজানো হয়েছে এক্সপ্লোসিভ। চকিতে মাথায় চিন্তাটা খেলা করে গেল, ডেটোনেটরের তারগুলো খোলার চেষ্টা করবে? পরমুহূর্তে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ের গতি আরও বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিল ও। যারা বিস্ফোরক বসিয়েছে তারা পেশাদার লোক, নিশ্চয়ই বিকল্প তার দিয়ে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যাতে বিপজ্জনক বিস্ফোরক নিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করতে না হয়।

ছুটছে রানা পঞ্চাশ গজ দূরের ছোট একটা টিলা লক্ষ্য করে হঠাৎ ওর মনে হলো দানবীয় একটা হাত ওকে পিছন থেকে তীব্র ধাক্কা দিয়েছে। প্রচণ্ড চাপে হুশ্ করে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে গেল। যেন ডানা গজিয়েছে ওর, উড়ে চলেছে। পনেরো ফুট উড়ে গিয়ে ধপ করে বালির উপর পড়ল ও। শরীরটা গড়িয়ে দেওয়ার পরও ঝাঁকির চোটে মনে হলো ব্যথায় সংজ্ঞা হারাবে কানের ভিতরে জোরাল ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। পর্দা ফেটে গেছে কি না কে জানে! গায়ের উপর এখনও খসে পড়ছে বালু আর কংক্রিটের গুঁড়ো। শ্বাস নিতেই নাকের ভিতর ঢুকে গেল। হাঁচি

আসছে। দম আটকে সেটা ঠেকাল ও, এক হাতে ওয়ালথারটা বের করে বুকের নীচে ধরে থাকল।

'বললাম না কাউকে আমি দৌড়ে বের হতে দেখেছি!'

দূর থেকে ভেসে এসেছে আওয়াজটা। আগেও লোকটার গলা শুনেছে রানা, চিনতে পারল।

'ঈশ্বর জানেন লোকটাকে খুঁজে না পেলে কী ঘটবে,' বলল দ্বিতীয়জন। 'বিরাট বিপদে পড়ে যাব আমরা।'

লোকগুলো ওকে দেখেছে তা হলে, ভাবল রানা। রাগে অল্প অল্প কাঁপছে ওর সর্বশরীর। আরেকটা চিন্তা মাথায় দোলা দিল। ওর হাত আর মুখে এখন ব্যান্ডেজ নেই। ডক্টর আহমেদকে চিনত এমন যে-কেউ ওকে দেখলে এক নজরেই বুঝবে ও নকল লোক। ওর আসল পরিচয়ও হয়তো জেনে যাবে। তা হতে দেওয়া যায় না। ছেঁড়া ব্যান্ডেজ ওকে ঢাকার জন্য যথেষ্ট নয়, তবে ওটা দিয়েই আপাতত যতটা পারা যায় কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ওয়ালথারটা দেহের পাশে রেখে দ্রুতহাতে মুখে ব্যান্ডেজ জড়াল ও, তড়িঘড়ি করে এমন একটা গিঁঠ দিল, যেটা দেখলে ওর বয়-স্কাউট টিচার নটিঙের উপর ওর এফিশিয়েন্সি ব্যাজ কেড়ে নিতেন। দুটো হাতই ঢাকার মতো ফিতে আর অবশিষ্ট নেই। থাকলেও সম্ভবত ঢাকার সময় পাওয়া যেত না। বামহাতটায় ফিতে জড়িয়ে নিল ও, ডানহাতটা ওয়ালথারসহ প্যান্টের পকেটে পুরল।

ঠিক সময়েই করতে পেরেছে কাজটা। আধ সেকেন্ড পর ছোট একটা ঢালের উপর দেখা দিল লোক দু'জন। ওকে দেখেই উত্তেজিত, নিচু স্বরে কী যেন বলল নিজেদের মধ্যে। রানা অপেক্ষা করল, এরা পিস্তল বের করে গুলি করবে, না কাছে এসে খালিহাতে ওকে খুন করতে চাইবে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করল। প্রায় দু'ভাঁজ 'দ' হয়ে বালির উপর পড়ে আছে ও। লোক দু'জন যদি ওকে অসহায় ভেবে থাকে, তা হলে তাদের বিস্মিত হতে

হবে। ওয়ালথার পিপিকের বাঁট শক্ত করে ধরল রানা।

সামনের লোকটার কথা শুনে খানিকটা অবাক হতে হলো ওকে।

'জেসাস ক্রাইস্ট! এক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো। লোকটা বোধহয় বিস্ফোরণের আগে বাঙ্কারের ভিতরে ছিল! চার্লস, লোকটা মরে গেলে খুনের মামলায় পড়ে যাবে তুমি!'

'আমি ভেবেছিলাম বাঙ্কারটা তুমি চেক করে দেখেছ,' কৈফিয়তের সুরে জবাব দিল চার্লস। 'নিয়মটা তুমিও ভাল করে জানো, পিট।'

লোকটার গলার চাপা উত্তেজনা আর আতঙ্ক রানাকে বলে দিল, সত্যি কথাই বলছে লোকটা। মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে সে। তবুও সতর্কতায় ঢিল দিল না রানা।

'কে আপনি?' দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। 'আরেকটু হলেই টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যেতেন আপনি!'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বিড়বিড় করল রানা। গলা সামান্য উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী হলো, বলুন তো! আমি ভিতরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছিলাম, এমন সময় টের পেলাম দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো। কোনরকমে বের হতে না হতেই ঘটল বিস্ফোরণ।'

'ডক্টর অ্যালি!' ব্যান্ডেজ দেখে চিনতে পারল বেঁটে লোকটা। 'হেল! আপনার কপালটাই খারাপ, স্যার। একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রথমে আগুনে ঝলসে যাওয়া, তারপর এই...'

'বাঙ্কারটা ওড়ালেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, এখনও ওয়ালথারের বাঁট থেকে হাত সরায়নি। তবে বুঝতে পারছে, এরা খুনি নয়। বাঙ্কারের ভিতরে কেউ ছিল বুঝতে পেরে দু'জনেই আতঙ্কে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। রানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো, ব্যাপারটা আসলেই কাকতালীয়।

বিশ্বাস করতে রাজি ছিল ও, কিন্তু এরপর লোকটার কথা শুনে বিষয়টা অন্যভাবে দেখতে বাধ্য হলো।

'বিশ মিনিট আগে ডক্টর রিচার্ড ফোন করে আমাদের বললেন, যাতে বাঙ্কারটা আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দিই।' আফসোস করে মাথা নাড়ল লম্বা লোকটা, চেহারায় লজ্জিত একটা ভাব। 'আর দশ সেকেন্ড আগে বিস্ফোরণটা ঘটলে আপনি নির্ঘাত মারা যেতেন, সার।'

মনে মনে সায় দিল রানা।

'কী ব্যাপার, অ্যালি?' রানা বাড়ির দরজায় পৌঁছুতেই বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল সামান্থা। 'মনে হচ্ছে যেন ধুলোয় গড়াগড়ি করে এসেছ!'

'সারাটা দিন ল্যাবে কাজ করার পর এমনটা না মনে হওয়াই বোধহয় অস্বাভাবিক,' সোফায় ধপ করে বসে ক্লান্ত স্বরে বলল রানা। সারাদিনে এই প্রথম কিছুটা অনুত্তেজিত বোধ করছে। বাঙ্কার বিস্ফোরণে কয়েক জায়গায় শার্ট ছিঁড়ে গেছে ওর, সাদা ব্যান্ডেজ মেটে রং ধরেছে। এখানে ওখানে গা চুলকাচ্ছে, সেই সঙ্গে আছে সামান্য মাথাধরা। হতাশও লাগছে। এপর্যন্ত কাজে নেমে কিছুই জানতে পারেনি ও।

'কিছু দেব তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা। নিষ্পলক চোখে রানাকে দেখছে মহিলা।

'গিয়ারটা ছেড়ে দাও, আমি গোসল করব,' বলল রানা। বার কাউন্টারের সামনে চলে গেল ও, গ্লাসে বুরবঁ ঢেলে চুমুক দিল কড়া তরলে। ডক্টর আলী আহমেদের মত লেমোনেড খাওয়ার মানসিক অবস্থায় নেই এখন ও।

'বলবে কি ঘটেছে, নাকি কাল সকালে পেপারে পড়তে হবে আমার?' জায়গা ছেড়ে নড়ল না সামান্থা।

মহিলার চোখের ভাষায় বোঝা গেল, না জেনে ছাড়বে না।

'ডক্টর রিচার্ড হ্যান্স একটা বাঙ্কার উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন, তখন ওটার বন্ধ দরজার ভিতরে ছিলাম আমি।'

'নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা!' বিস্ফারিত চোখে বলল সামান্থা। মাতাল আর জুয়াড়ী হতে পারেন, কিন্তু ডক্টর রিচার্ড খুন করার মত মানুষ নন, রানা।'

ওর নাম ধরে ডাকা ভুল হয়েছে মহিলার, কিন্তু কিছু বলল না রানা। ঘরের যেখানে যা ও রেখে গিয়েছিল তার কিছুই সরানো হয়নি। নতুন করে ছারপোকা বসায়নি কেউ।

খুলে বলল রানা, কীভাবে বাঙ্কার থেকে বের হয়ে এসেছে। বর্ণনা শেষে যোগ করল, 'আমার হাতে একমাত্র সূত্র বলতে আছে শুধু কাল রাতে ডক্টর রিচার্ডের রহস্যময় মিটিং।'

'যে-লোকটা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, তার কাছে কোন আইডি ছিল না?'

'না। প্রফেশনাল।' একটু থামল রানা, তারপর বলল, 'তুমি এবার খানিকক্ষণের জন্যে আমাকে একলা থাকতে দাও। অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।'

মহিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা হলো অন্দরমহলের দিকে। চেহারা দেখে মনে হলো রেগে গেছে রানার রুক্ষ আচরণে।

সামান্থা চলে যেতেই দেরি না করে ব্রিফকেসটা কফি টেবিলের উপর রেখে চারপাশের লাইনিং খুলতে শুরু করল রানা। লাইনিঙের নীচ থেকে বের হলো প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক কমপোনেন্ট। ওটা ব্যবহার করে সাধারণ টেলিভিশনকে ক্র্যাম্বল করা টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটে পরিণত করা যায়। শামসের আলীর কেরামতি। ছোট একটা প্যাকেট টিভির অ্যান্টেনার সঙ্গে যুক্ত করল রানা, তারপর খুদে একটা ভিডিও ক্যামেরা রাখল টিভি সেটের উপর। টিভি ছেড়ে ক্যামেরার সামনে সোফায় বসে পড়ল ও এবার, বুরবঁর গ্লাসটা আড়ালে সরিয়ে দিল। সেট অন করতেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে একটা চ্যানেলে টিউন হয়ে গেল ওটা।

স্ক্রিনে ইলোরাকে দেখা গেল, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। রানাকে দেখে চেহারায় কোন ভাবান্তর হলো না।

'দিস ইয এম আর নাইন। নীডিং বস্।'

জবাবে সামান্য মাথা দোলাল ইলোরা, তারপর সামনের কন্সোলের বাটনে চাপ দিল। স্ক্রিনের দৃশ্যটা পাল্টে গেল। এবার দেখা গেল মেজর জেনারেলের অফিস। বাঘের মতো গম্ভীর চেহারায় ডেস্কের পিছনে বসে আছেন রাহাত খান, চুরুট ফুঁকে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়লেন।

'ওয়েল, রানা?' রানার দুরবস্থা দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাঁর। 'আসল জিনিসটার ব্যাপারে কাজ কতোদূর এগোল?'

'এখনও কিছু করতে পারিনি, সার।'

'দ্যাট্স্ ব্যাড,' বললেন গম্ভীর রাহাত খান। 'ওরা আবারও কোনও টেস্ট করার আগেই জিনিসটা নষ্ট করে দেওয়া দরকার।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ডক্টর আলী আহমেদের খুনিকে খুঁজে বের করার ব্যাপারটা এগোল? এটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট নয়, তবে খুনিকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না।'

'সিআইএর ফাইল হ্যাক করতে হবে, সার,' সংক্ষেপে যা ঘটেছে রিপোর্ট করার পর জানাল রানা। 'আমার ধারণা ডক্টর রিচার্ড হ্যান্সের বিস্তারিত ফাইলটা দেয়া হয়নি আমাকে। সিআইএর কাছে কিছু জানতে চাইছি না। আলী আহমেদের খুনীকে খুঁজে বের করতে হলে ওটা আমার দরকার। শামশের আলী কি ব্যবস্থা করতে পারবেন? আমার মনে হয় ডক্টর রিচার্ডকে যা মনে হচ্ছে তিনি তেমন নন। সমস্ত কিছুর পিছনে তিনি থাকলেও আমি অবাক হব না।'

'তোমার জন্য সিআইএর বেশ কিছু ফাইল হ্যাক করেছেন শামশের আলী,' বললেন রাহাত খান। 'তার মধ্যে রিচার্ড হ্যান্সের ফাইল আছে কি না দেখছি।' বাটনে চাপ দিয়ে কম্পিউটারের

বিরাট স্ক্রিন অন করলেন তিনি। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল, তারপর বললেন, 'জুয়ার নেশা আছে লোকটার। হয়তো তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে কেউ। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেতনের টাকায় তার চলে না, ধার করতে হয়।'

'এরকম একজন লোককে এত উঁচু পদে বহাল রাখার কারণ, সার?'

'ব্রিলিয়ান্ট লোক। তার প্রয়োজনীয়তা এত বেশি যে দোষগুলোকে ক্ষমা করতে দ্বিধা করেনি কর্তৃপক্ষ। একরকম বাধ্য হয়েই তাকে প্রজেক্ট ডিরেক্টর করা হয়, নইলে চাকরি করত না। ইচ্ছে করলেই ভাল কোন কোম্পানিতে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেতন পেতে পারে সে।'

'তা হলে সেরকম চাকরিই করছেন না কেন? জুয়ার ধার শোধ করা সহজ হত।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'সম্মান। প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনে সে-ই সর্বেসর্বা। ব্যাপারটা তার কাছে দারুণ উপভোগ্য।' রানার দিকে কড়া চোখে তাকালেন তিনি। 'তা ছাড়া তোমার জানা থাকার কথা, নেশাখোর জুয়াড়ীদের চাহিদা কোনভাবেই মেটানো সম্ভব নয়।' আরেকটা বাটন টিপলেন মেজর জেনারেল। 'এবার আসা যাক অ্যাডাম ব্রিলের ব্যাপারে। এ-ও ডক্টর আলী আহমেদের খুনি হতে পারে। একেও হিসেব থেকে বাদ দিয়ো না। লোকটা মেয়েমানুষের জন্য পাগল। হয়তো সে-কারণে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। অথবা হয়তো তাকে এত টাকা দেয়া হয়েছে যে, স্বেচ্ছায় প্রজেক্ট স্যাবোটাজ করতে চেষ্টা করছে।'

কথাটা দু'সেকেন্ড ভেবে দেখল রানা। 'লোকটাকে আমার এমন মনে হয়নি যে চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে, সার। সামান্য দেখায় তাকে আমার অত্যন্ত গর্বিত মানুষ বলে মনে হয়েছে।'

'আর কিছু, রানা?'

'দু'জনের ফাইলই আমার দরকার, স্যার।'

'সেট অন রাখো। পাঠানো হচ্ছে।' নির্দিষ্ট বাটন টিপলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'যা করার দ্রুত করতে হবে, রানা। দ্বিতীয় টেস্টের আগেই। প্রয়োজনে লেযার সুইচটা ধ্বংস করে দেবে, যে-করে হোক।' স্ক্রিন থেকে মুছে গেল তাঁর অবয়ব, বদলে দেখা দিল লাইনের পর লাইন তথ্য। সঙ্গে ছবিও আছে। আপনাআপনি ওগুলো রেকর্ড হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমপোনেন্টে।

পড়তে শুরু করল রানা। শেষ করে উঠতে উঠতে সাপারের সময় হয়ে গেল। এর মধ্যে কয়েকবার এসে ঘুরে গেছে সামান্থা। পড়া শেষে সম্পূর্ণ মেমরি মুছে দিল রানা, ইকুইপমেন্টগুলো ব্রিফকেসের লাইনিঙে আগের মতো ভরে রেখে চলে গেল গোসল করতে। পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে। টেবিলে ওর জন্য সাপার পরিবেশন করে অপেক্ষা করছে সামান্থা।

নীরবে সাপার সারল ওরা, তারপর চলে গেল যে-যার বিছানায়। সামান্থা বেডরুমে, আর রানা সোফায়।

বেডরুমের দরজাটা খোলাই থাকল।

পাঁচ

'আপনি কি নতুন বাঙ্কারটা দেখতে যাবেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর রিচার্ড।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রানা, মনে মনে ভাবছে কতক্ষণ ব্যান্ডেজগুলো ওর পরিচয় গোপন রাখতে পারবে। রিচার্ডের সঙ্গে যত সময় কাটাচ্ছে, ওর মনে হচ্ছে লোকটা ও আসলে আলী আহমেদ নয়।...ডক্টর আহমেদের খুনি করেই জানে ও নকল লোক।

'এই বাঙ্কারটা আগেরটার চেয়ে বড়,' বললেন অ্যাডাম, কার্টে রানার পাশে বসেছেন। 'আগেরটাতে ক্যারিজ মাউন্টের সমস্যা ছিল। আমরা চেষ্টা করছি এবারের টেস্ট যাতে যতটা পারা যায় নির্ভুল হয়। পরীক্ষাটা সফল হবার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন রিচার্ড হ্যান্স, মরুভূমির বুক চিরে প্রায় নিঃশব্দে ছুটল ইলেকট্রিক কার্ট। বারবার ঝাঁকি খাচ্ছে জিনিসটা, লাফিয়ে উঠছে। পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগছে ওদের। নিজেকে ঝালমুড়িওয়ালার কৌটোয় ভরা মুড়ি মনে হলো রানার।

'ট্র্যাকিঙের জন্যে নতুন কম্পিউটার বরাদ্দ করা হয়েছে,' জানালেন রিচার্ড হ্যান্স। 'প্রথম টেস্টের জন্যে আমরা ডিইসি মডেল চেয়েছিলাম, মনে পড়ে, ডক্টর আহমেদ?'

মাথা দোলাল রানা। কী বলা হচ্ছে তার কিছুই ওর জানা নেই। কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল, নইলে ও যে এসব ব্যাপারে কত বড় একটা গণ্ডমূর্খ সেটা টের পেয়ে যাবে ডক্টর রিচার্ড আর ব্রিল। মনে মনে গাল বকল রানা। অ্যাসাইনমেন্টটা এত আচমকা ওর কাঁধে চেপেছে যে আগে থেকে প্রায় কিছুই ওর পক্ষে জেনে নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দু'একটা যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য হয়তো আলী আহমেদ হিসেবে ওর অবস্থান জোরাল করতে কাজে আসত।

'প্রথম পরীক্ষা সফল হওয়ায় শেষপর্যন্ত কম্পিউটারটা আমাদের দেয়া হয়েছে,' আবার শুরু করলেন রিচার্ড হ্যান্স। ঘাড় ফিরিয়ে মাতালের চিকচিকে চোখে রানার দিকে তাকালেন। 'চার্জ

তৈরির সময় পাওয়ার মনিটর করতে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি ওটাকে আমরা।'

অ্যাডাম ব্রিল যোগ দিলেন আলোচনায়। 'আগের মত ভুল হবার ক্ষীণ সম্ভাবনাও এখন আর নেই। নিখুঁত ভাবে ট্র্যাকিং করবে কম্পিউটারটা।' ডক্টর রিচার্ডের দিকে চেয়ে হাসলেন মৃদু। 'তবে এসব বলে ডক্টর আহমেদকে উৎসাহিত করা যাবে বলে মনে হয় না। বেচারার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। দেখছেন না, কথা বলাও কমিয়ে দিয়েছেন?'

'র.তটা কষ্টে গেছে,' বিড়বিড় করল রানা। 'ঘুমাতে পারিনি।'

'পোড়া ক্ষতগুলোর কারণে,' বললেন ব্রিল। 'বুঝতে পারছি।'

'টেস্টের ব্যাপারে বলুন,' বলল রানা।

'রিমোট কন্ট্রোল চালিত একটা ট্যাঙ্ক আসবে। ওটাকে লেযার ছুঁড়ে ধ্বংস করে দিতে হবে। কোনও ব্যাপারই নয়। চাইলে আমরা একবার লেযার ছুঁড়ে ডজনখানেক ট্যাঙ্কও অকেজো করে দিতে পারি।'

এরা কি জেনে গেছে দুটো লেযার সুইচের পার্থক্য? মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করতে শুরু করল রানার।

কার্ট থামল একটা বাঙ্কারের সামনে। কমাণ্ডোরা কড়া পাহারা দিচ্ছে, একদল ঘিরে রেখেছে বাঙ্কার, আরেকদল টহল দিচ্ছে। লেযার টেস্টের সময় শুধু দূরে সরে যাবে তারা। সিকিউরিটি চীফ এনএসএ-র টপ এজেন্ট জোনাথন হার্কারকে সিকিউরিটি পাস দেখাতে হলো ভিতরে ঢোকার সময়। বাঙ্কারটা আগেরটার মতই প্রায়, তবে আকারে বেশ খানিকটা বড়। ক্যাপাসিটরগুলো আগের চেয়ে দূরে দূরে বসানো হয়েছে।

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ঘুরে দেখতে শুরু করল রানা বাঙ্কারের ভিতরটা, একটি বার ভুলেও কন্ট্রোলের কিছুতে হাত দিল না, লেযার সুইচটা খুঁজে পাবার পর থেকে ওর মনোযোগ বেশিরভাগটাই থাকল ডক্টর রিচার্ড আর ব্রিলের উপর। দু'জনের

কাউকেই ওর বিচলিত মনে হলো না। দু'জনই মনোযোগ দি ওভাররিড্স আর সেফটি পরীক্ষা করে দেখছেন। পরীক্ষামূ টেস্ট চালানোর জন্য সব ঠিক আছে কি না তা স্থির কর তাঁরা।

'আমাদের কি অভযার্ভেশন বাঙ্কারে যেতেই হবে?' জি করল রানা। 'টিলার ওপর থেকে দেখলে হয় না?'

'হয়,' জবাবটা দিলেন রিচার্ড। 'আপনার অস্বস্তির কার বুঝতে পারছি। আসলে কোনও বাঙ্কারই লেযার ক্যানন থে নিরাপদ নয়। ঠিক আছে, চলুন।'

বাঙ্কার দেখা যায় এমন একটা টিলার উপর উঠল ওর সমতল বালিতে ম্যাট্রেস পেতে বসল। চোখের সাম বিনকিউলার তুলল রানা। বাঙ্কারের সামনে বালির বিস্তৃত সমুদ্র বেশ দূরে একটার পর একটা বালিময় ঢাল।

ওদিকে লেযার ক্যাননের গোল মাথাটা নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

আঙুল তুলে দূরে দেখালেন অ্যাডাম ব্রিল, তারপর বললেন, 'ওই যে, ট্র্যাকিং শুরু করে দিয়েছে।'

বিনকিউলারের মধ্য দিয়ে রানা দেখল, ছোট্ট বিন্দুটা আসলে একটা ট্যাঙ্ক। সরাসরি আসছে না ওটা, কম্পিউটার ট্র্যাকি সিস্টেমকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বারবার ডানে বামে সরে গি দিক বদল করছে। কখনও বেড়ে যাচ্ছে গতি, কখনও থেমে পড়ছে বা গতি কমিয়ে দিচ্ছে। ক্যাপাসিটরের কড়কড় শব্দ পেল রানা, একই সঙ্গে ভারী ওযোনের গন্ধ। লেযার ক্যানন আরও নি হলো, তার পরপরই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো চোখ ধাঁধানো একটা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটল ওটার ভিতর থেকে। ঝলকানিটা এত তীব্র যে বিদ্যুৎ-দেবতা থরও বোধহয় খুশি না হয়ে পারতেন না।

লেযার ডিসচার্জের প্রাথমিক চমক কাটিয়ে উঠে ট্যাঙ্কের দিকে

বিনকিউলার তাক করল রানা। অবশিষ্ট বলতে তেমন কিছুই আর নেই অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রটার। ট্যাঙ্কের ঠিক মাঝখানে আঘাত হেনেছে লেযার, পুরু ধাতুর পাত যেন কিছুই নয়, আর্মার্ড স্টিল গলিয়ে বাষ্প করে দিয়ে ঢুকে গেছে বালির ঢালের ভিতরে। লেযার ক্যাননের ক্ষমতা জানা থাকার পরও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। একটা হৃৎস্পন্দন হতে যতটুকু সময় লাগে, তার আগেই কুঁকড়ে গলে একটা ছোটখাট স্তূপ হয়ে গেছে অগ্রসরমান ট্যাঙ্ক।

ডক্টর রিচার্ডের উত্তেজিত গলার আওয়াজে বাঙ্কারের দিকে আবারও মনোযোগ দিল রানা।

'ওহ্ গড! নোও! আবার লেযার ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওটা!'

যেন নিশ্চিত নয় কী করতে হবে, ঝাঁকি খেতে খেতে উপরের দিকে উঠছে লেযার ক্যাননের মাথা। মাটি থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উপরে স্থির হলো জিনিসটা। সামান্য নড়ে লক্ষ্য স্থির করে নিল। ফাইন ট্র্যাকিং গিয়ার ওটাকে আরও সূক্ষ্ম ভাবে তাক করছে, তার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, সেই সঙ্গে ক্যাপাসিটর রিচার্জ হওয়ার কড়কড় শব্দ। কিন্তু কীসের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে কামানটা?

'থামাতে হবে ওটাকে!' প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রিচার্ড হ্যান্স। 'হয়তো কোন অ্যারোপ্লেন ফেলে দেবে লেযার ছুঁড়ে! ক্রাইস্ট! ওটার রেঞ্জ দু'হাজার মাইল!' একটু থমকালেন তিনি, তারপর বাঙ্কারের দিকে দৌড়াতে শুরু করে স্বগোতোক্তি করলেন, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি রিচার্জ হলো কী করে!'

পিছন থেকে তাঁকে দেখে মনে হলো একটা কাকতাড়ুয়া, তীব্র বাতাসে নড়বড় করে উড়ে চলেছে। অ্যাডাম ব্রিলের দিকে তাকাল রানা। ব্রিল নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করে বললেন, 'চলুন, যাওয়া যাক। কী ভুল হলো সেটা বের করতে হবে। নিয়ন্ত্রণহীন লেযার ক্যানন থাকার চেয়ে না থাকা ভাল!'

সাবধানে ভাবে ডক্টর রিচার্ডের পিছু নিলেন তিনি। বিনকিউলার গলায় ঝুলিয়ে অনুসরণ করল রানা। কয়েক যাবার আগেই ঘটল লেযার বিস্ফোরণ। সূর্যের রশ্মির প্রখরতা অনায়াসে হার মানিয়ে গাঢ় একটা উজ্জ্বল আলো আকাশের দিক ছুটে গেল। বিনকিউলার চোখে দিয়ে উপরে তাকাল রানা। কো কিছু নেই। কোন ধোঁয়া, জঞ্জাল, আগুন–কিচ্ছু না! লেযার যা ধ্বংস করুক না কেন, সেটা আকাশের অনেক বেশি উচ্চতা ছিল।

প্রায়ান্ধকার বাঙ্কারে ঢুকে ও দেখল কন্ট্রোল প্যানেলের সাম বসে আছেন রিচার্ড হ্যান্স। তাঁর কাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে দেখছে অ্যাডাম ব্রিল। সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'আমাদের কিছু করার ছি না, ডক্টর রিচার্ড। আরেকটা ম্যালফাঙ্কশান। এতে কারও হা নেই।'

পিএ সিস্টেমে কড়ড়-কড়ড় আওয়াজে রানা বুঝল, কমান্ড বাঙ্কার যোগাযোগ করতে চাইছে। রেডিও সিস্টেমের সুইচটা ও অন করে দিল। সরাসরি কথা বলা যাবে এবার।

'কী ঘটল এটা?' কর্কশ একটা গলা খেঁকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'নোরাড আমাদের গালাগাল দিচ্ছে! আপনারা গাধামো করে একটা চাইনিজ মিলিটারি স্যাটেলাইট ধ্বংস করে দিয়েছেন!'

'ম্যালফাঙ্কশান হতেই পারে না,' প্রতিবাদের সুরে বললেন রিচার্ড। 'ক্যাননটা ওই স্যাটেলাইটকে টার্গেট করে লেযার ছুঁড়েছে! ফেলে দিয়েছে ওটাকে!'

ঠাণ্ডা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিজ্ঞানী দু'জনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল রানা। দু'জনের কাউকেই ওর বিস্মিত মনে হলো না। নাকের নীচে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন রিচার্ড, একবার প্যান্টের পকেট চাপড়ালেন। বোধহয় মদের বোতল খুঁজলেন লেযার ক্যাননের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ব্রিল।

'কী ঘটেছে?' নীরবতা ভাঙল রানা।

'নতুন কম্পিউটারের প্রোগ্রামিঙে কোথাও ভুল রয়ে গিয়েছিল,' বললেন ডক্টর রিচার্ড। 'এছাড়া আর তো কিছু হবার উপায় দেখি না। সেফটি আর ইন্টারলকগুলো কাজ করেনি। কাকে কী বলছি! আপনিই তো ওগুলোর বেশির ভাগ তৈরি করেছেন!...কিন্তু ক্যাপাসিটরগুলো এত দ্রুত রিচার্জ হয় কী করে!'

'ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি,' বললেন ডক্টর ব্রিল। 'সম্ভবত লেযার সুইচের কারণেই এটা হয়েছে।' রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি কি জিনিসটাকে আরও ডেভেলপ করেছেন, ডক্টর?'

'খানিকটা,' অস্ফুট স্বরে বলল রানা।

'ক্যাননটা একটা চাইনিজ মিলিটারি স্যাটেলাইট ধ্বংস করে দিয়েছে!' বললেন অ্যাডাম ব্রিল। 'প্রচুর অঙ্ক না কষলে এরকম একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এ কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না।'

'আমি অরবিটাল ডাইনামিক্সের ব্যাপারে কিছু জানি না,' রুক্ষ স্বরে বললেন রিচার্ড। 'আমি কেমিস্ট। তা ছাড়া, অরবিটাল প্যারামিটারের ব্যাপারে আমার কোন অ্যাক্সেসও নেই।'

'কেউ আপনাকে দোষ দিচ্ছে না, ডক্টর,' অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বললেন ব্রিল। 'তবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে আমাদের স্যাবোটাজ করা হয়েছে।'

'কে করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চিনারা? নিজেদের মিলিটারি স্যাটেলাইট ধ্বংস করে দেবে তারা? আমার তা মনে হয় না।'

'কাজটা যারই হোক, সে ওই স্যাটেলাইটের অরবিট জানত,' বললেন ব্রিল। 'কম্পিউটার রিপ্রোগ্রামিংও তার অজানা নয়। কাজটা ভিতরের কারও। আমি, আপনি, ডক্টর হ্যান্স আর সিকিউরিটি চীফ ছাড়া আর কেউ জানে না কীভাবে কম্পিউটার রিপ্রোগ্রামিং করতে হয়।'

দু'জন বিজ্ঞানীর প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক মনে হলো রানা
বাঙ্কারের ভিতর উত্তেজনা বাড়ছে। থমথমে নীরবতাময় পরিবেশ
ভারি অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। তারপর ব্রিল বললেন, '
আমাদের আর কিছু করার নেই। শিডিউল ঠিক করে নিয়ে
ট্যাঙ্কের অবস্থা দেখতে যাওয়া যাক। কংগ্রেশনাল সাবক...
আলোচনা সভায় যদি লেযার প্রজেক্ট চালু রাখার জন্যে ...
হয়, তা হলে লেযার ক্যাননটা কত কাজের জিনিস সেটা প্রমা...
চেষ্টা করা দরকার আমাদের।'

'ওরা জানে প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনের আবিষ্কার ক...
কাজের জিনিস,' বিড়বিড় করলেন রিচার্ড। 'গড! এর ব্যাখ্যা ...
কী করে আমরা?'

দু'মিনিট পর গলিত ট্যাঙ্ক দেখতে বাঙ্কার থেকে বের হ...
ওরা তিনজন। হাই গ্রেড স্টিলের গলিত অবশিষ্টাংশ দেখে ভিত...
ভিতরে শিউরে উঠল রানা। আমেরিকার হাতে এমন একটা ...
থাকা মানেই সেটা ব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনা। যারা অ্যাটম বো...
ফেলে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ খুন করতে দ্বিধা করেনি
ইরাক ও আফগানিস্তানে পিঁপড়ের মত মেরেছে মানুষ, তাদে...
কাছে লেযার ক্যানন থাকা তো গোটা দুনিয়ার সমস্ত সভ্য...
অস্তিত্বের জন্যে বিরাট বড় ঝুঁকি।

'দেখুন মিস্টার রানা, আমি কৈফিয়ত চাই না,' গুড়গুড় করে উঠ...
সিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ডগলাসের গলা। 'আমার রেয...
দরকার। আপনাকে শরীর ট্যান করার জন্যে মরুভূমিতে পাঠানো
হয়নি। আসল লোকটাকে আমাদের দরকার। যে-লোক
এসবের পিছনে আছে।'

টেলিফোনের ভিতর দিয়ে লোকটার লালচে তিল-ভরা ফোল...
পোঁদে কষে একটা লাথি মারতে পারলে ভাল হত, তিক্ত মনে
ভাবল রানা। লোকটার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কাজটা করে দি...

রাজি হওয়ায় ও আমেরিকানদের কেনা গোলাম হয়ে গেছে। মনে মনে রাহাত খানের নির্দেশ আউড়ে নিজেকে শান্ত রাখল রানা।

'চাইনিজরা জানিয়ে দিয়েছে যা ঘটেছে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা না করলে তারা ডিযার্মামেন্ট চুক্তিতে সই করবে না,' ঘেউ-ঘেউ করে উঠল ডগলাস। 'আমরা তা করতে পারি না। তাতে গোটা দুনিয়ার সামনে ছোট হতে হবে।'

'হবি শালা ছোট, তাতে কী যায় আসে! বিনা প্ররোচনায় ইরাক আক্রমণের পর ছোট হতে তোদের বাকি আছে কিছু?' মনে মনে বলল রানা। সামান্য নীরবতার পর মুখ খুলল, 'আমি আমার সাধ্য মত করছি।'

'এখন দেখা যাচ্ছে সেটুকু যথেষ্ট নয়,' খেঁকিয়ে উঠল ডগলাস। 'আপনার ওপর ভরসা করে আমরা বোধহয় ভুলই করেছি।'

ওপ্রান্তে খটাস্ করে ফোন রেখে দেওয়া হলো। আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানাও। লোকটার বাপ-মা তুলে গাল দেবে না ঠিক করে ফেলেছে। গাল দিলে ওই খারাপ গালিরও অসম্মান করা হবে।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব,' রানা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সামান্থা। পোশাক পাল্টে বেরোনোর জন্য তৈরি সে। চোখের ভাষাই বলে দিচ্ছে, মনস্থির করে ফেলেছে। না নিতে চাইলে তাকে বেঁধে রাখতে হবে।

রানা দ্বিধা করছে দেখে বলল, 'অ্যালিকে বিয়ে করার আগে সিআই-এর এজেন্ট ছিলাম আমি, রানা; কথাটা ভুলো না। আমি তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকব না। হয়তো কোন সাহায্যেও আসতে পারি আমি।'

'ঠিক আছে, চলো,' তর্কাতর্কি এড়িয়ে গেল রানা। সামান্থা জানে বিপদ ঘটতে পারে। সেজন্য মহিলা মানসিক ভাবে প্রস্তুত।

'ডক্টর রিচার্ডের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করব আমি। যদি বে... তা হলে অনুসরণ করব। জানা দরকার সে-রাতের মত ... একই কাজ করে কি না লোকটা।'

ভ্রূ কুঁচকাল সামান্থা। 'তুমি অনুসরণ করছিলে সেটা ... সে টের পেয়েছিল?'

এক মুহূর্ত ভেবে উত্তর দিল রানা, 'জানি না। বোধহয় ... আমাকেও অনুসরণ করা হয়। আমার মনে হয় না সেটা ... রিচার্ডের নির্দেশে। তবে নিশ্চিত হতে পারিনি। স্পাই যদি ... থাকে, ধূর্ত আর বিপজ্জনক লোক হবে ডক্টর রিচার্ড।'

দ্বিমত পোষণ করল সামান্থা। 'রিচার্ড হ্যাস? অনেক ... মাতাল থাকে সে বেশিরভাগ সময়। হয়তো স্পাই সে, কিন্তু ... সে কারও কোন বিপদ ঘটাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'এই যে মনে হচ্ছে না, এটাও হয়তো তার কৃতিত্ব,' ব... রানা। 'হয়তো সামান্য মদ কুলি করে তারপর মাতালের অভি... চালিয়ে আসছে।'

'অ্যালি কখনও এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি। সন্দেহ করেনি ডক্... রিচার্ডকে। সবসময় বলে এসেছে, মাতাল হলেও ডক্টর রিচার্ড ... গুণী মানুষ।'

কথা বাড়াল না রানা, গাড়ির চাবিটা পকেট থেকে বের ক... বলল, 'চলো, যাওয়া যাক।'

ফোর্ড পিকআপ জীপটা ঢালের এক পাশে, ডক্টর রিচা... বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে পার্ক করল রানা। দূরে দেখা ... শহরের আলো, মিটমিট করে জ্বলছে। আধঘণ্টা অপেক্ষার ... বাড়ি থেকে বের হলো একটা ছায়ামূর্তি। গাঢ় অন্ধকারে ... দাঁড়িয়ে কী যেন করছে।

'চুপ করে বসে থাকো,' নিঃশব্দে গাড়ির দরজা খুলে ... পড়ল রানা। 'আমি দেখে আসি লোকটা কে।'

সামান্থা প্রতিবাদ করার আগেই বাড়ির দিকে রওয়ানা হ...

গেল ও। শেষ পনেরো ফুট এগোল ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে, তারপর পৌঁছুল হাঁটু সমান উঁচু পাথরের বাউন্ডারি দেয়ালটার কাছে। সাবধানে উঁকি দিল রানা। লোকটা বাড়ির কোনায় ঝোপের মধ্যে দাঁড়ানো কারও সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলছে। কার সঙ্গে বোঝা গেল না।

'স্যাটেলাইট আমি ঠিকই ফেলে দিয়েছি, দিইনি?' চাপা স্বরে বলল ছায়ামূর্তি।

আরও ভাল করে শোনার জন্য ডানদিকে সরল রানা। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না লোকটাকে, তার গলার আওয়াজেও পরিচয় বুঝার উপায় নেই। প্রায় ফিসফিস করছে।

'টাকা পেলে আমার কোন আপত্তি নেই,' আবার ভেসে এল চাপা গলা। সাদা একটা খাম ছায়ামূর্তির কালো পোশাকে ঢুকে গেল। ঘুরেই দ্রুত পায়ে ডক্টর রিচার্ডের গাড়ির দিকে ছুটল লোকটা। কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের কারণে এবারও তার চেহারা বা আকৃতি স্পষ্ট দেখা গেল না।

ভোঁতা গর্জন ছেড়ে স্টার্ট নিল ডক্টর রিচার্ডের গাড়ি। গিয়ার দিয়ে স্কিড করে রওয়ানা হয়ে গেল। রাতের নীরবতা চিরে দ্রুত ছুটে চলেছে। জীপের কাছে ফিরে এল রানা, এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে চাপা গলায় সামান্থাকে বলল, 'শক্ত করে ধরে বসো।'

এক্সেলারেটারে পায়ের চাপ বাড়াল রানা। বাঁক ঘোরার পর দূরে দেখতে পেল ডক্টর রিচার্ডের গাড়ির অস্পষ্ট টেইল লাইট। খুব বেশি সময় লাগল না, দূরত্বটা কমিয়ে আনল ও। আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ওর জীপকে পিছনে ফেলে দেওয়ার সাধ্য নেই গাড়িটার।

লোকটা ফ্রীওয়ে ছেড়ে ইঁটের একটা রাস্তা ধরে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। 'তুমি জানো কোথায় যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। রাস্তা থেকে চোখ সরাল না।

জবাবে নীরবে মাথা নাড়ল সামান্থা।

তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে জীপ। তীক্ষ্ণ বাঁক নেওয়ার ; বাঁকের উল্টো পাশের চাকা দুটো মাটি ছেড়ে উঠে পড়ছে, গাড়িটা কাত হয়ে যাচ্ছে। হু-হু করে ভিতরে ঢুকছে রাতের শীতল বায়ু, চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে ওদের। প্রতি দূরত্ব কমছে দুটো গাড়ির।

প্রথমে লোকটাকে ধরবে, ঠিক করল রানা, তারপর এনভেলপটা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করবে। কড়া ভাবে করলে লোকটা সম্ভবত ভেঙে পড়বে। হয়তো স্বীকার ফেলবে সে-ই ডক্টর আলী আহমেদের হত্যাকারী। ডক্টর রি কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তাদের মধ্যে কী চুক্তি হয়েছে এ জানাও হয়তো খুব একটা কঠিন হবে না। তারপর লোক একটা ব্যবস্থা করে আরেকবার প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভে কম্পাউন্ডে ঢুকবে ও, ঝুঁকি নেবে না, যেভাবে পারে লেযার সুই ধ্বংস করে দেবে।

ইঁটের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড় ডক্টর রিচার্ডের গাড়ি, পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তৈরি একটা খাদে ভিতর দিয়ে ধুলোর মেঘ তুলে ছুটে চলেছে।

রানার বাহুতে আলতো করে হাত রাখল সামান্থা। 'রান পাহাড়ের ওপাশে সোলার পাওয়ার টেস্ট স্টেশন। ডক্টর রিচার্ড সেখানেই যাচ্ছেন?'

চুপ করে থাকল রানা। ডক্টর রিচার্ডের ওখানে যাবার কো কারণ নেই। তবে জায়গাটা নির্জন। হয়তো ডক্টর রিচার্ডের কা থেকে লেযার ক্যাননের গোপন তথ্য নিতে ওখানে কোন প্লেন নেমেছে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তা হলে ডক্টর রিচা বাড়ির সামনে টাকা লেনদেন করা হলো কেন? লেনদেনটা কা কে? ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায়নি ও। লোকটা আসলেই ডক্টর রিচার্ড কি না তা-ও নিশ্চিত ভাবে জানার উপা নেই।

প্রশ্নগুলোর কোন জবাব নেই। যা ঘটছে তার পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না ও, যেন চোরাবালিতে চিন্তা-স্তম্ভের ভিত্তি নির্মাণ করছে। কী কারণে কী হচ্ছে সেটা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে লোকটাকে ধরে জেরা করা।

'সাবধান, রানা!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সামান্থা।

ব্রেকে চেপে বসল রানার পা, চেহারা নির্বিকার। হড়কাতে হড়কাতে চুলের কাঁটার মত বাঁক ঘুরতে শুরু করল জীপ। গাড়ির নাকটা রাস্তা বরাবর হতেই আবার মেঝে স্পর্শ করল গ্যাস পেডাল।

রানা ভাবতেও পারেনি সামনের গাড়িটা ইতিমধ্যেই ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গাড়িটা এখন সরাসরি ওর জীপের দিকেই ছুটে আসছে!

একেবারে শেষ মুহূর্তে বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ডানদিকে ঘোরাল রানা। পাশ দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল ডক্টর রিচার্ডের গাড়ি। সরাসরি পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে রানার জীপ! এই গতিতে পাথুরে পাহাড়ে ধাক্কা মারলে প্রচণ্ড সংঘর্ষে চুরমার হয়ে যাবে গাড়িটা, সেই সঙ্গে ওরাও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে মরবে। বামদিকে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে শুরু করল রানা, সেই সঙ্গে ব্রেকে চাপ দিল। ধুলোর কারণে পিছলে গেল চাকাগুলো, তবে ঘুরছে গাড়িটা। কর্কশ ধাতব আওয়াজ হলো একটা। ডানদিকের ফেন্ডার পাথরে বাড়ি খেয়ে তুবড়ে গেল। আরও খানিক হড়কে থামল জীপ। ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সামান্থা, রানার দিকে তাকাল। মনে মনে মহিলার সাহসের প্রশংসা করল রানা। বুকের ভিতরটা এখনও দুরুদুরু করছে ওর। ফর্মুলা ওয়ান রেসিঙে মাঝেমধ্যে এধরনের ঝুঁকি নিতে হত ওকে।

'আমাদের মেরে ফেলতে চায়,' নিচু গলায় বলল সামান্থা। 'লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।'

জবাব দিল না রানা। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে ওর। জীপ

ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল আবার ডক্টর রিচার্ডের গাড়ির পিছনে।
ঘুরতেই ওটার লাল বাতি দেখা গেল। তিন মিনিটের মাথায়
প্রায় থাকল না বললেই চলে। 'শক্ত হয়ে বসো,' নির্দেশ
রানা। 'হাল ছাড়বে না লোকটা।'

রাস্তা সামান্য চওড়া হতেই এগিয়ে এসে ডান পাশ
ডক্টর রিচার্ডের গাড়ির গায়ে গুঁতো মারল রানা। ধাতুর সঙ্গে
সংঘর্ষে গা রী-রী করা আওয়াজ হলো। গাড়ির তুলনায়
অপেক্ষাকৃত ভারী। ওজনটা কাজে লাগিয়ে গাড়িটাকে ঠেলে
রাস্তা থেকে নামিয়ে দিল রানা, চাইছে লোকটা নিয়ন্ত্রণ হারাক।

বিস্মিত হতে হলো ওকে। ব্রেক করেছে লোকটা।
পড়ল, তারপর নিপুণ দক্ষতায় একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে
গাড়িটা। যে-কোন প্রথম শ্রেণীর স্টান্টম্যানের ঈর্ষা হত দেখে
থেমে নেই লোকটা, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েই উল্টোদিকে ছুটল
আবার।

রানা অনুভব করল, ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ে দাঁড়িয়ে গেছে
ব্যাপারটা। লোকটাকে চলে যেতে দেয়া যাবে না। ভুরু কুঁচকে
উঠল ওর। পেটমোটা মাতাল ডক্টর রিচার্ডের সঙ্গে এরকম
ড্রাইভিং ঠিক যেন মেলে না। জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার অনুসরণ
শুরু করল ও।

আরেকবার বাঁক নিয়ে অন্য একটা কাঁচা রাস্তা ধরে
চলেছে ডক্টর রিচার্ডের গাড়িটা। রাস্তা পুনঃনির্মাণের
সাইনবোর্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। লোকটার পিছনে থাকতে
গিয়ে নিজের পুরো দক্ষতা কাজে লাগাতে হচ্ছে রানাকে। সামনে
গাড়িটার ওড়ানো ধুলোর কারণে পাঁচ ফুটের বেশি দেখতে পাচ্ছে
না ও। হেডলাইটের আলোয় রিচার্ডের গাড়ির ক্রোম বাম্পার
অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। দু'দিকে ফাঁকা জায়গা আছে দেখে জীপ নিয়ে
গাড়িটার পাশে চলে এল রানা। ড্রাইভারকে আবছা ভাবে দেখতে
পেল হুইলের পিছনে, সামনে ঝুঁকে গভীর মনোযোগে ড্রাইভ

করছে লোকটা।

আবার গাড়িটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করল রানা। জীপের ডানদিকের ফেন্ডার গাড়িটার বামদিকের ফেন্ডারে গুঁতো মারল। গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা, এবার লোকটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে দিতে সুবিধা হবে।

ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাল গাড়িটা, পাক খেতে শুরু করেছে। কী করে যেন সামলে নিল ড্রাইভার ওটাকে। পিছন থেকে তেড়ে এলো বুনো ষাঁড়ের মতো।

'কিছু ধরে বসো, সামান্থা,' চাপা গলায় বলল রানা। চট করে একবার দেখে নিল মহিলার ফ্যাকাসে চেহারা। যেভাবে ড্যাশবোর্ড খামচে ধরেছে তাতে নখের চিরস্থায়ী দাগ রয়ে যাবে ওটাতে।

জীপটা ডানে-বামে করে পিছনের গাড়িটাকে সামনে আসতে বাধা দিচ্ছে রানা। ঘাড়ে খচ্ করে লাগল, সিটের হেডরেস্টে মাথা সেঁটে গেল ওর। পিছন থেকে জোরাল গুঁতো দিয়েছে বেপরোয়া ড্রাইভার। এই সুযোগটাই খুঁজছিল রানা। কষে ব্রেক করল ও। পিছনের গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল জীপের বাম্পারে। মড়মড় করে দেবে গেল জীপের পিছন দিক।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে লোকটা আচমকা সামনে থেকে প্রবল বাধা পেয়ে। একপাশে পিছলে যেতে শুরু করল তার গাড়ি। পুরু ধুলোর পর্দা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল গাড়ি দুটোকে।

'চলে যাচ্ছে!' নিচু গলায় বলল সামান্থা।

গিয়ার দিয়ে রানা দেখল, ঠিকই বলছে মহিলা। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় গাড়িটা স্থির করে নিয়ে জীপ ছাড়িয়ে সামনে ছুটছে গাড়িটা। লোকটার দক্ষতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। ড্রাইভ করতে গিয়ে দু'হাত টনটন করছে ওর। ঘাড়ের কাছেও ব্যথা। পিছন থেকে ধাক্কা খাওয়ার সময় আঘাত লেগেছে। গাড়িটার কাছে যাবার জন্য আবার দ্রুত গতি তুলল ও। গতি বাড়ছে, ফলে দু'জনই ওরা সেঁটে গেল সিটের সঙ্গে। গাড়িটা অন্তত দুশো গজ

এগিয়ে গেছে, কিন্তু জীপের এঞ্জিন এখনও মসৃণ ভাবে ক
করছে। দূরত্ব কমতে সময় লাগবে না। শক্তিশালী এঞ্জিনের গ
রাতের নীরবতা ছাপিয়ে উঠছে।

'রানা!' বলে উঠল সামান্থা। 'ওর কাছে অস্ত্র আছে!'

রানাও সামনে ছোট্ট একটা লালচে স্ফুলিঙ্গ দেখতে পে
কড়াৎ করে বজ্রপাতের মতো আওয়াজ হলো। সন্দেহ নেই
অস্ত্র আছে। উইন্ডশিল্ডে যেন একটা নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে।
একপাশ চুরচুর করে দিয়ে পিছলে গেল ভারী ক্যালিবারের বু
শিস কেটে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল তপ্ত সিসেটা। আ
তিনবার আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল রানা, সেই স
বিস্ফোরণের আওয়াজ। তবে একটা বুলেটও জীপের গায়ে লা
না। সিনেমায় যেমনটা দেখা যায়, বাস্তবে তেমন ভাবে ছু
গাড়িতে গুলি লাগানো অতটা সহজ নয়। তা ছাড়া .৩৮-এর চে
ভারী ক্যালিবারের বুলেট না হলে সাধারণত কোন গাড়ির গা ফু
হয় না। সেজন্য অবশ্য ওদের বিপদের ঝুঁকি কমেনি। ক্যালি
যা-ই হোক, কাঁচ ফুটো করে চলে আসতে পারে বুলেট যে-কো
সময়।

ড্যাশবোর্ডের নীচে মাথা গুঁজে দিল সামান্থা। প্রতিবার গুলি
আওয়াজের সঙ্গে কেঁপে উঠছে তার সমস্ত দেহ। হুইলের সাম
ঝুঁকে বসল রানা, গ্যাস পেডালে চাপ বাড়াল। দুটো গাড়ির মা
দূরত্ব এখন বড়জোর ছয় ইঞ্চি। গাড়ির জানালা দিয়ে পিস্তল
বের হতে দেখল রানা। লক্ষ্য যাতে স্থির করতে না পারে সেজ
একপাশ থেকে ধাক্কা মারল ও।

রিচার্ডের গাড়িটা পিছলে নেমে পড়ল রাস্তার ধারে বা
মধ্যে। এখনও নিয়ন্ত্রণ হারায়নি লোকটা। কী করে যেন আ
ফিরে এল রাস্তায়। পিছু নিল রানা, মনে মনে গাল বকল। ক
কান্ট্রি রেসে প্রতিযোগিতা করে নাকি লোকটা?

দুটো গাড়ির অবস্থাই খারাপ। রিচার্ডের গাড়ির সাইলেন

ভেঙে পড়েছে, বিকট আওয়াজ করছে এঞ্জিন। ওটার পিছনের ট্রাঙ্কটাও তুবড়ে খুলে গেছে, বারবার উঠছে নামছে। রানাকে সামনে এগোতে বাধা দিতে এদিক ওদিক করছে লোকটা তার গাড়ি। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এত গুঁতো খাওয়ার পরও একটা টেইল লাইট এখনও আস্ত আছে গাড়িটার। হেডলাইট একটা নিভে গেছে। অন্যটাও মিটমিট করছে। শর্ট সার্কিট। নিভে যাবে যে-কোন সময়।

রানার জীপের এঞ্জিন মিস ফায়ার করতে শুরু করেছে। ধুলোয় ভরে গেছে বোধহয় এয়ার ফিল্টার। ফুয়েল লাইনও লিক করছে। গ্যাসোলিনের কড়া গন্ধ রানাকে বলে দিল, আর বেশিক্ষণ ধাওয়া করতে পারবে না ও। হয় এঞ্জিনে আগুন ধরে যাবে, নয়তো পুরো ছিঁড়ে যাবে ফুয়েল লাইন।

'এখনও লোকটা সামনে?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা।

'হ্যাঁ, কিন্তু ওর একযস্ট থেকে যেরকম ধোঁয়া বের হচ্ছে তাতে আর বেশিক্ষণ সামনে থাকতে পারবে না। মোবিল পুড়ছে। এই গতিতে চললে এঞ্জিন সিয হয়ে যাবে।'

উঠে বসল সামান্থা।

রানা লক্ষ করল, ড্রাইভার যেভাবে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে লড়ছে তাতে ধরে নেয়া চলে, পাওয়ার স্টিয়ারিঙেরও দফারফা হয়ে গেছে।

'লোকটার কাছে এখনও অস্ত্র আছে,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল সামান্থা।

'অস্ত্র আমার কাছেও আছে,' সামনের গাড়ির পিছনে আরেক গুঁতো দিয়ে জানাল রানা।

শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল সামান্থা। ডক্টর রিচার্ডের গাড়ির উপর থেকে চোখ সরছে না তার।

আবার গুঁতো দিল রানা। জবাবে লোকটা যা করল সেজন্য ও প্রস্তুত ছিল না। পাশে পিছলে সরতে সরতে উল্টোদিকে স্টিয়ারিং

ঘোরাল লোকটা, গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে গতি তুলতে শুরু করল। পুরো এক পাক ঘুরে জীপের পিছনে চলে এল তার গাড়ি।

তারপর মনে হলো সবকিছু স্লো মোশনে ঘটছে। হেডলাইটের আলোয় রাস্তার দু'পাশের গাছের ভিতর থেকে দুটো এম-১৬ অটোমেটিকের মাযল বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। পিছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ডক্টর রিচার্ডের গাড়ি। আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল রানা। এম-১৬ থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

জীপের প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টের ভিতর ভোমরার মত গুঞ্জন তুলল ডজন খানেক .২২৩ বুলেট, বারবার ধাতুতে লেগে পিছলে যাচ্ছে।

ছয়

'রানা! আমার গুলি লেগেছে!'

জীপের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ফাঁকে চট করে একবার পাশে তাকাল রানা। কপাল বেয়ে রক্ত নামছে সামান্থার। মাথার আঘাত সবসময়ই অনেক বেশি রক্ত ঝরায়, তবে সে-ব্যাপারে কেউ কথা বলতে পারলে ধরে নেয়া চলে, আঘাতটা মারাত্মক নয়।

'এটা কপালে চেপে ধরে রাখো,' পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল রানা। 'ব্যথা লাগবে, কিন্তু চোখে রক্ত পড়ে অন্ধ হতে হবে না।'

সামান্থা ক্ষতটার উপর রুমাল চেপে ধরল।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথার পিপিকে বের করল রানা। প্রিয় অস্ত্রের স্পর্শ স্বস্তির একটা অনুভূতি এনে দিল। নিজেকে আর অসহায় মনে হলো না ওর।

আরেকদফা বুলেট কম্পার্টমেন্টের ভিতর গুঞ্জন তুলল। ছোট আকৃতির শক্তিশালী বুলেটগুলো মরুভূমিতে আক্রমণ চালানোর জন্য আদর্শ।

মাথা উঁচু করে সামনে দেখতে চেষ্টা করল রানা। আক্রমণকারীদের কাছে স্টারলাইট স্কোপ নেই বলে মনে হলো ওর, নইলে প্রথম দফার বুলেট বর্ষণেই ও আর সামান্থা মারা পড়ত। শুধুই সাইট ব্যবহার করে গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো। সংখ্যায় তারা অন্তত চারজন হবে। পিছনে গাড়িতে আছে সশস্ত্র লোকটা। ফাঁদের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা।

'আমরা সারেন্ডার করছি!' জীপ প্রায় থামিয়ে চিৎকার করল রানা।

'রানা!' নিচু গলায় প্রতিবাদ করল সামান্থা। 'ওরা আমাদের খুন করে ফেলবে!'

'জানি। আমি চাইছি ওরা ভুল বুঝুক। হয়তো ভাববে আমার কাছে পিস্তল নেই। অসাবধান হয়ে পড়বে তা হলে। যদি সংখ্যায় ওদের কমানো যায় তা হলে সুযোগটা নেয়া দরকার।' জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা। কাঁচটা চুরমার হয়ে পড়ে গেছে বুলেটের আঘাতে।

জীপটা এখন থেমে পড়েছে। বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করল রানা। পেশিগুলো ঢিলে করে দিল। শরীর উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে থাকলে তার প্রভাব পড়বে আঙুলের উপর। ওয়ালথারের হেয়ার ট্রিগারে ঝাঁকি লাগবে তা হলে। লক্ষ্যের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে বুলেট। অথচ একটা বুলেটও নষ্ট করা চলবে না এখন।

'কী ব্যাপার, রানা? ওরা তো কিছু করছে না!'

অপেক্ষার প্রহর সবসময়ই মনের উপর চাপ ফেলে।

'তৈরি হয়ে থাকো, আমি বললেই ঝেড়ে দৌড় দেবে। ও দু'পাশ থেকে ঘিরছে আমাদের। ক্রস ফায়ারে ফেলতে চা আমি যদি এপাশের লোকগুলোকে শেষ করতে পারি তা হ পাহাড়ের দিকে যেতে পারব আমরা। অন্ধকারে হারিয়ে যা চেষ্টা করতে পারব।'

'ঠিক আছে,' নিচু গলায় বলল সামান্থা।

গলায় যতটা আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছে রানা, তার শতক একভাগও মনের ভিতর অনুভব করছে না। বাইরের ও লোকগুলো নিজেদের কাজে দক্ষ। এখন মাথার চুল ছিঁড়ে কে লাভ নেই। আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল কোনও ফাঁদে পড় পারে।

আরও পনেরোটা হার্টবিট গুনল রানা, তারপর ওর সুযো এল। নক্ষত্রের আলোয় দেখতে পেল, একটা ওক গাছের আড় থেকে দৌড়ে বের হলো অসাবধানী এক লোক, একটা বড় সল্ট সাইডারের দিকে আসছে। কড়াৎ কড়াৎ করে দু'ব বজ্রপাতের মত আওয়াজ করল রানার ওয়ালথার। আরও দু' এগোল লোকটা, তারপর টলে উঠে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড় তার লাশ।

সঙ্গীর আকস্মিক মৃত্যু অন্য লোকটাকে আড়াল থেকে বে করে আনল। লোকটার উচিত ছিল আগেই কাভারিং ফায়ার করা তার ভুলের কারণেই এখন মরুভূমির বালিতে পড়ে আছে প্রথ লোকটার মৃতদেহ। নিজের ভুল সংশোধন করতেই বেরিয়ে এসেছে এখন সে। এটা আরেকটা ভুল। চোখে দুটো গুলি খেয়ে মাশুল দিল তার। মগজটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এক পাক ঘুরে মাটিতে পড়ল লাশটা। পড়বার আগে তার তর্জনীটা আঁকড়ে ধরেছিল এম-১৬-এর ট্রিগার। মেশিনগানের মত এক নাগাড়ে গুলি বের হলো অস্ত্রটা থেকে। ক্লিপ শেষ হয়ে যাওয়ায় থামল

উপর্যুপরি বিস্ফোরণ।

লাশ দুটো রানা আর সামান্থার জন্য পালাবার রাস্তা খুলে দিয়েছে। মহিলার হাত ধরে নিজের দিকের দরজা খুলল রানা, নেমে পড়ল দু'জন জীপ থেকে। অন্য লোকগুলো গুলি করতে শুরু করেছে। একটা গুলিও খামোকা ব্যয় করছে না। অ্যামেচার হলে চারপাশে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করত, তা করছে না। চারপাশে গুলি করলে বিপদ হতে পারত, কিন্তু সে-বিপদ বুঝেশুনে যেভাবে গুলি করা হচ্ছে তার চেয়ে কম।

কাতরে উঠল সামান্থা। তার ডান বাহুর মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। রক্ত ছলকে বের হতে দেখল রানা। থেমে ক্ষতটা চেপে ধরতে চাইল সামান্থা। রানা থামল না, সামন্থার বামহাত আঁকড়ে ধরে জোর টান দিল।

দৌড়ের ফাঁকেই ঝুঁকে পড়ে প্রথম লাশের এম-১৬টা তুলে নিল ও। চট করে সামান্থাকে সামনে ঠেলে দিয়েই ঘুরে বসে পড়ল এক হাঁটুর উপর, তারপর সুইচটা অটোমেটিকে নিয়ে যেখান থেকে মাযল ফ্ল্যাশ দেখেছে, সেদিকে একটানা গুলি ছুঁড়ল। ক্লিপটা শেষ করে থামল। মাঝখানে একবার শুনতে পেল তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার। লোকটা মারা গেছে কি না তা বোঝা গেল না। তাতে কিছু আসে যায় না। পিছনে আছে দুর্ধর্ষ ড্রাইভার, আর ডানে আছে এম-১৬ সহ চতুর্থ লোকটা। তাদের দিকেই এখন মনোযোগ দিতে হবে। থেমে থেমে গুলি করছে চতুর্থ লোকটা।

পিছন থেকে .৩৮-ও গর্জন ছাড়ল। আওয়াজটা এম-১৬-এর .২২৩ বুলেটের বিস্ফোরণের চেয়ে ভারী, গম্ভীর আর কর্কশ। তবে রানাকে যদি বলা যায়, দুটোর যে-কোন একটার গুলিতে আহত হওয়া বেছে নিতে হবে, বিনা দ্বিধায় .৩৮-এর গুলিতে আহত হতে চাইবে ও। .৩৮ বুলেট দেহের ভিতর ঢুকে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে না, নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয় না .৩৮-এ। এই দূরত্বে .২২৩

বুলেটের শক্তি বড়সড় .৩৮ বুলেটের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি।

তবে দুটোর কোনটার আঘাতে আহত হবার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে নেই রানার। 'এসো!' চাপা স্বরে সামান্থাকে তাগাদা দিল রানা, 'সরে যেতে হবে। গাছের আড়াল পাব সামনে।'

রানার গুলিতে মৃত দ্বিতীয় লোকটার সামনে খানিকটা উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামান্থা। লোকটার খুলি ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট দুটো। ধূসর মগজ বেরিয়ে এসেছে। রক্তও ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, শুকনো বালি দ্রুত শুষে নিয়েছে তা। সোঁদা গন্ধটা গা গুলিয়ে দেয়।

বাম হাত ধরে টান দিল রানা সামান্থার। 'এসো! জলদি!'

'লোকটা মারা গেছে,' ভোঁতো গলায় বলল সামান্থা।

হাতে আবার টান দিল রানা। 'থামলে আমরাও মারা যাব। এসো!'

একটা ছোট শুকনো নদীখাতের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা। দু'পাশের উঁচু পাড় ওদের আড়াল হিসাবে কাজ করছে। পঞ্চাশ গজ গিয়ে একবার থামল রানা, দেখে নিল সামান্থা ওর পিছনেই আছে কি না, তারপর আবার দৌড়াতে শুরু করল। হালকা দৌড়। এই গতিতে বেশ কয়েক ঘণ্টা দৌড়াতে পারবে ও।

'রানা!' কয়েক মিনিট পর ফুঁপিয়ে উঠল সামান্থা। 'আমি আর যেতে পারব না। মাথা ঘুরছে।' কথাটা শেষ করেই বালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, রানা ধরবার সময় পেল না।

সামান্থাকে চিত করল রানা, ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল দ্রুততার সঙ্গে। মাথার আঘাতটা আঁচড়ের মত। তবে এখনও সামান্য রক্ত পড়ছে। বাহুর ক্ষতটা থেকেও রক্ত ঝরছে। ব্লাউজে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের জাল। বিনা দ্বিধায় ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলল রানা। এখন ভদ্রতার সময় নয়। একটা বুলেট আড়াআড়ি ভাবে দুটো স্তনের গোড়ার দিকে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতটা দৈর্ঘ্যে অন্তত নয় ইঞ্চি। অগভীর ক্ষত। গুরুতর কিছু নয়, তবে অনেক রক্ত

হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে সামান্থা। ব্লাউজটা কয়েক প্রস্থ করে ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল রানা।

'রানা,' চোখ পিটপিট করে তাকাল সামান্থা। 'কী হয়েছে? আমার শুধু মনে পড়ছে দৌড়াচ্ছি আর দৌড়াচ্ছি। ফুসফুসটা যেন জ্বলে যাবে। তারপর পড়ে গেলাম। তারপর...'

'শুয়ে থাকো খানিকক্ষণ,' নরম গলায় বলল রানা। 'এখানে আসার সময় আরেকটা গুলি লেগেছে তোমার গায়ে। শক্তি সঞ্চয় করে নাও। এখানে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে।'

'আমি হাঁটতে পারব না, রানা। সত্যি দুঃখিত। মনে হচ্ছে হাঁটুগুলো রাবারের তৈরি। তুমি চলে যাও। আমার জন্যে তুমিও ধরা পড়লে...সাহায্য নিয়ে ফিরে এসো।'

'সাহায্য?' তিক্ত হাসল রানা। 'সাহায্য পাবার উপায় নেই। এরা পেশাদার। যদি তোমাকে এখানে ফেলে যাই তা হলে মৃতদেহটা এমন ভাবে লুকাবে যে, কেউ আর কখনও তোমার খোঁজ পাবে না।'

'তুমি বরং নিজে বাঁচার চেষ্টা করো,' সামান্থার মৃদু স্বরটাও অদ্ভুত দৃঢ় শোনাল। সন্দেহ নেই সিআইএ তাকে ভালো ট্রেনিং দিয়েছে। স্রেফ কথার কথা বলছে না।

'সেটা নির্দেশ বহির্ভূত হয়ে যাবে,' অবলীলায় মিথ্যে বলল রানা। 'তোমার নিরাপত্তার বিষয়টা বিশেষ ভাবে দেখতে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

কথাগুলো ওষুধের মতই কাজ করল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সামান্থার। আস্তে করে রক্তাক্ত মাথাটা রাখল রানার বাহুতে।

'অনেক ধন্যবাদ, রানা। আমি জানি তুমি মিথ্যে বলছ। ভুলে যাচ্ছ আমি সিআই-এর এজেন্ট ছিলাম? অ্যাসাইনমেন্টে এধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কী করতে হবে তা সবসময়েই ব্রিফ করা হয়। আগে মিশন, তারপর আর সব কিছু। ইচ্ছা করলে আমাকে ফেলে

চলে যেতে পারতে তুমি। এখনও পারো। কেউ কিছু মনে করবে না। আমিও না।'

'আপাতত আমার মিশন হচ্ছে দু'জনই বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সামান্থা, মুখে হাত চাপা দিয়ে ঠেকাল তাকে রানা। রাতের মরুভূমিতে অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। অপেক্ষা করল আবার শোনার জন্য। হ্যাঁ, ওই তো, পাথরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে পাথর।

'ওরা আসছে। কাছে চলে এসেছে। চুপ করে ছায়ার মধ্যে শুয়ে থাকবে, সামান্থা, সহজে ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না। আমি যাচ্ছি। লড়াইটা ওদের কাছে পৌঁছে দেব। আশা করি ফিরে আসতে বেশি দেরি হবে না।'

সামান্থাকে সাবধানে পাঁজাকোলা করে তুলে খানিকটা দূরে একটা ঝোপের ছায়ার নীচে শুইয়ে দিল রানা।

শীতল বালিতে মাথা রেখে শিউরে উঠল সামান্থা। সামান্য সরে গিয়ে দেখল রানা, রক্তের কারণে শরীরে প্রচুর বালি লেগে আছে সামান্থার, যে-কারণে এত কাছ থেকেও সহজে বোঝা যাচ্ছে না তার উপস্থিতি। সন্তুষ্ট হয়ে খাদের পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। উপরে উঠে বালিতে মিশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। অপেক্ষা করছে কখন লোকগুলো ওদের খুঁজতে আসবে।

'ওরা কাছেই আছে,' একটা গলা শুনতে পেল ও, চাইনিজ ভাষায় কথা বলছে। 'এখনও রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছি।'

'আস্তে বলো!' অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় বলল দ্বিতীয়জন। এ-ও সম্ভবত চাইনিজ। চাইনিজেই বলছে। 'মরুভূমিতে আওয়াজ অনেক দূর ভেসে যায়।'

দুটো গলার একটাও পরিচিত নয়। মনোযোগ একীভূত করল রানা। কাছের ওই লোক দু'জন যে-কোন সময় দেখা দেবে।

'আর রক্তের দাগ নেই,' প্রথম কণ্ঠ আবার বলল। 'বোধহয়

ব্যান্ডেজ করে নিয়েছে।'

'দুটোর কোনটার গায়ে গুলি লেগেছে? মেয়েটা আহত হলে ভাল ঝামেলাতেই আছি আমরা। আর লোকটা আহত হয়ে থাকলে আধঘন্টার মধ্যে দুটোকে খতম করে সরে যেতে পারব।'

'আমি খেয়াল করেছি, মাতারি অন্তত একটা গুলি খেয়েছে। হারামজাদা একবারও গুলি খায়নি বোধহয়।...এবার কোনদিকে যাব?'

'এগিয়ে চলো, যদি চিহ্ন দেখে বুঝি ঘুরে আমাদের পিছনে যায়নি তা হলে খেলা শেষ করতে বেশি দেরি হবে না।'

'ওই আহত মাতারিকে নিয়ে শালা যাবে কোথায়! পিছনে গেল তো মরল। হান ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

হান! হানটা কে? ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। হ্যান্সের বিকৃত উচ্চারণ? এরাই বা চাইনিজ বলছে কেন? তা হলে কি চাইনিজরাই প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনকে স্যাবোটাজ করছে?

চুপ হয়ে গেছে লোক দু'জন, হানের পরিচয় সম্বন্ধে আর কিছু জানা গেল না। সামান্থা আর ওর পায়ের চিহ্ন দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে দুই চাইনিজ, যাচ্ছে সামান্থা যেখানে আছে সেদিকে। হাতে যদি সময় থাকত তা হলে চিহ্ন মুছে দেওয়ার চেষ্টা করত রানা, ভুল দিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করত লোকগুলোকে, কিন্তু সময় ওর বিরুদ্ধে কাজ করছে। শিকার ধরবার অপেক্ষায় থাকা চিতাবাঘের মতো স্থির হয়ে থাকল রানা।

একটু পরই লোক দু'জনকে দেখতে পেল। ওয়ালথারের দুই গুলিতে দু'জনকে খতম করে দেওয়ার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল। কাজটা নীরবে সারতে পারলে বাড়তি সুবিধা পাবে ও। এদের কথা থেকে এখন ওর জানা হয়ে গেছে কাছেই শত্রুপক্ষের আরও লোক আছে। গুলির শব্দ শুনলেই হয়তো একযোগে তেড়ে আসবে আততায়ীর দল। অসতর্ক হবার সুযোগ নেই কোন।

ওয়ালথারটা শোল্ডার হোলস্টারে রেখে দিল রানা, ডান হাতে

বেরিয়ে এলো স্টিলেটো। ফলাটা বুড়ো আঙুল আর তর্জ... মাঝখানে আলতো করে ধরল ও, বাঁটের দিকটা থাকল ওর ... স্পর্শ করে।

প্রথম লোকটা খাদের ভিতরে ওর পাঁচ ফুট দূর দিয়ে ... হলো। দ্বিতীয় লোকটা আছে তার কয়েক গজ পিছনে। দ্বিতীয় ... ওকে পাশ কাটিয়ে যেতেই নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা, লাফ ... নামল ঠিক তার পিঠের কাছে। এক হাতে মুখ পেঁচিয়ে ... তীক্ষ্ণধার ফলার পোচ দিল ও লোকটার উইন্ডপাইপে। দু'টুক... হয়ে গেল কণ্ঠনালী। শক্ত হয়ে গেল লোকটার দেহ, শরীর ... মোচড়াতে চেষ্টা করল, তারপর শিথিল হয়ে গেল। কোন ... যাতে না হয় সেজন্য আস্তে করে লোকটাকে খাদের মেঝে... নামিয়ে রাখল রানা।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়।

সামনের লোকটা আবছা ঘড়ঘড় আওয়াজ পেয়ে ... দাঁড়িয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলেই ... করল। রানার কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল ... বুলেট। অজান্তেই খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল রানা। লোক... দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়বার আগেই ওর হাত থেকে উড়াল দিল স্টিলে... চোখা ফলাটা খচ্ করে গেঁথে গেল পিস্তলধারীর বুকে। যতে... ভিতরে ঢুকবার কথা ছিল পাঁজরের একটা হাড়ে ঘষা খাওয়ায় ... ঢুকল না। তবে হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে। লোকটার আঙুলগু... অবশ হয়ে গেল। হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ল। বোকা... মতো বুকে গাঁথা ছোরার বাঁটের দিকে তাকাল সে। হ্যাঁচকা টা... দিয়ে পুরোটা ফলা বের করে আনল। তারপর বালিতে আছ... পড়ল গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো।

স্টিলেটো সংগ্রহ করে লোকটার শার্টে রক্ত মুছল রা... ডানবাহুর খাপে রেখে দিল ওটা। দু'জনকেই সার্চ করল এরপর ... পরিচয়সূচক কিছু নেই চাইনিজ দু'জনের কারও কাছে। তারা ক...

হয়ে কাজ করছিল জানা গেল না। একটা এম-১৬ তুলে নিল রানা, অন্যটার ম্যাগাযিন বের করে নিয়ে চলে এলো সামাস্থার কাছে।

ঘুমাচ্ছে রক্তক্ষরণে ক্লান্ত সামান্থা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ঘুম থেকে তুলতে হবে। সরে যেতে হবে এখান থেকে। গুলির আওয়াজটা অন্যান্যদের সতর্ক করে দিয়েছে। হয়তো ভাবছে তাদের দু'জন আততায়ীর একজন সফল হয়েছে। কিন্তু দু'জনের কেউ যখন তাদের সাফল্য রিপোর্ট করবে না, তখন কী ঘটেছে বুঝে এদিকে আসবে তারা অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে।

'সামান্থা, ওঠো,' আস্তে করে ঠেলা দিয়ে নিচু গলায় ডাকল রানা।

'ইচ্ছে করছে না। মাত্র শুয়েছি। অসুস্থ লাগছে। ঘুমাব।'

'সামান্থা!'

চোখ মেলতে যেন কষ্ট হলো সামান্থার। কয়েক সেকেন্ড লাগল দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে। রানাকে দেখার পর বুঝতে পারল কোথায় আছে।

'রানা? লোকগুলো চলে গেছে? আমি দুঃস্বপ্নে দেখলাম তুমি খুন হয়ে গেছ। ঠিক যেন সিনেমা। দেখলাম স্লো মোশনে তোমার মাথার ভিতর ঢুকছে গুলি। মারা যাবার পরও তড়পাচ্ছিল তোমার দেহ। ভয়ঙ্কর!'

'উঠে পড়ো,' নিচু গলায় বলল রানা, বামহাত ধরে টলায়মান সামান্থাকে উঠতে সাহায্য করল। 'পিছনে আসা দু'জনকে আমি মেরে ফেলেছি, কিন্তু ওদের আরও লোক আছে। সংখ্যায় সম্ভবত তারা অনেক। দূরে সরে যেতে হবে আমাদের।'

'পাহাড়ে অনেক গুহা আছে,' বলল সামান্থা। 'ওগুলোর একটায় আমরা আশ্রয় নিতে পারি। সামনের দিকটা ব্যারিকেড দিয়ে নিলে সাহায্য আসার আগে পর্যন্ত তোমার রাইফেলটা দিয়ে ওদের ঠেকানো যাবে।'

'গুড আইডিয়া। যে গুহাটা ভাল হয় সেটা দেখিয়ো তু
রানা চেপে গেল যে সাহায্য আসার কোন সম্ভাবনা নেই। প
প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে যেতে হবে ওদের।

কিছুক্ষণ পরই মাটিতে পড়ে যাওয়া অচেতন সামান্থাকে
কাঁধে তুলে নিতে হলো ওর। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। এ
হাঙ্গামার পর ক্লান্তি লাগছে ওর নিজেরও। কাঁধের উপর সাম
ক্রমেই যেন আরও ভারী হয়ে উঠছে। চারপাশে পাহাড়ের স
মাঝখানের একটা খাদ ধরে এগিয়ে চলেছে রানা, ডান হাতে
রাইফেলটা আসন্ন বিপদ মোকাবিলায় তৈরি। পিছনে পড়ে অ
ওর ভাঙা গাড়ি আর বন্দুকযুদ্ধের আলামত। সামনে বেশ দ
প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনের পুব সীমানা। ওর মনে পড়ল, সা
বলেছিল, ওদিকটা ব্যবহৃত হয় সোলার পাওয়ার টেস্ট স্টে
হিসাবে।

পাহাড়ে গুহা খুঁজে পাওয়া যতোটা কঠিন হবে বলে ম
করেছিল ও, তারচেয়ে অনেক সহজে পাওয়া গেল একটা উপযু
পাথুরে গুহা। সামান্থাকে শক্ত পাথরের মেঝেতে শুইয়ে দিল ও
জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করে ওটাকে তার বালিশ হিসাবে ব্যবহ
করল। অজ্ঞান হয়ে গেছে সামান্থা, অথবা কোমায় চলে গেছে
বুঝবার উপায় নেই আপাতত। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাই
রানার শরীর। সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও। বি
একটা বোল্ডারে পিঠ ঠেকিয়ে তারার আবছা আলোয় নীচের র
প্রকৃতির বুকে চোখ বুলাল। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। অ
তার মানে এই নয় যে লোকগুলো হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গে
শরীর সুস্থ থাকলে টিলার এবড়োখেবড়ো খাড়া দেয়াল বে
কারও চোখে ধরা না পড়েই দিনের আলোতেও উঠে যেতে পা
রানা, সোলার পাওয়ার টেস্ট স্টেশনে গিয়ে সাহায্য পাবার চে
করতে পারত, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সেটা অসম্ভব বলে ম
হচ্ছে।

ঝিমাতে শুরু করল রানা। সামান্থা একবার হাঁচি দেওয়ায় চমকে রাইফেল তুলল গুলি করার জন্য। নীচে কেউ নেই এখনও।

'জেগেছ?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' ঘুম-জড়ানো স্বরে জানাল সামান্থা। 'কী ঘটেছে? আমাকে তুমি খাদের ভিতরে শুইয়ে দিলে। তারপর কী যেন বললে। হাঁটলাম আমি। তারপর আর কিছু মনে নেই।' গুহার মুখে রানার পাশে এসে বসল সে।

সারারাত কীভাবে হেঁটে এখানে এসেছে সংক্ষেপে সামান্থাকে জানাল রানা। পুব আকাশে একটা রুপালী রেখা দেখা দিয়েছে। নক্ষত্রগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর একঘণ্টা পরই মরুভূমির আকাশ নীল করে দিয়ে পাহাড়ের ওপাশ থেকে উঠে আসবে ভোরের সূর্য। তার খানিক পরই তপ্ত হয়ে উঠবে চারপাশ।

'সরে যেতে হবে,' বলল রানা। 'নইলে ঠিকই ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে।'

'হয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছে লোকগুলো।'

'আমার তা মনে হয় না। এতো সহজে হাল ছাড়ার লোক নয় তারা।' একটু থামল রানা, তারপর বলল, 'আমরা যদি টিলা পেরিয়ে সোলার পাওয়ার স্টেশনে যেতে পারি, তা হলে হয়তো ওখান থেকে ফোন ব্যবহার করতে পারব। সেক্ষেত্রে সিআইএ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।'

'তা হলে ডক্টর রিচার্ডই অ্যালিকে খুন করেছে?'

'আমারও ওরকমই মনে হচ্ছিল, তারপর লোক দু'জনের কথা শুনে এখন সন্দেহের মধ্যে আছি। দু'জনই তারা চাইনিজ। তাদের বসের কথা বলছিল। নাম বলল হান। সম্ভবত তার কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছে সবাই।'

ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখে ওদিকে মনোযোগ দিল রানা।

লোকটা পাহাড়ের গোড়ায় আর একশো গজ দূরেও নেই
গলায় সামান্থাকে নির্দেশ দিল ও, 'গুহার ভিতরে যাও।'

প্রতিবাদ করল সামান্থা, 'সাপ থাকতে পারে।'

'থাকলেও এই শীতে গর্ত থেকে বের হবে না।'

সামান্থা ভিতরে চলে যাবার পর বামহাতের তালুর উপর এম-১৬ স্থির করল রানা, শরীরটা ঠেস দিল প্রকাণ্ড বোল্ডারের গায়ে। লোকটার মাথায় লক্ষ্যস্থির করেছে। খুব ধীরে ট্রিগার চেপে বসতে শুরু করল ওর তর্জনী। গুলি বেরিয়ে যেতে একটু নড়ল রাইফেলটা। টাশ্ করে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, ডানদিকে পাথরের মেঝেতে পড়ল ব্যবহৃত গুলির খোসা। একই সঙ্গে কেঁউ করে উঠল ওর টার্গেট করা লোকটা। টিলার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল তার মৃতদেহ।

পরক্ষণেই রানার মাথার উপরে নিরেট পাথর যেন বিস্ফোরিত হলো। পাথরের কুচি দাঁত বসাল ওর ঘাড়ের পিছনে। ডজনখানেক রাইফেলের হুঙ্কার ভোররাতের সুনসান নীরবতা ভেঙে দিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোকগুলো। তাদের মাজল ফ্ল্যাশগুলো আবছা আলোয় পাকা কমলালেবুর মতো দেখাল।

সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে শুরু করল রানা। তাতে যে ওর সন্তুষ্টি আসছে তা নয়। কপাল ভাল থাকলে প্রতি পাঁচটা গুলিতে একবার মাত্র প্রতিপক্ষদের শরীরে গুলি লাগাতে পারছে ও। ম্যাগাযিন খালি হয়ে গেল। অন্য ম্যাগাযিনটা রাইফেলে ঢোকাল এবার।

'ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা, সামান্থা,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল রানা। 'ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তোমাকে সরে যেতে হবে। সোলার পাওয়ার স্টেশনে গিয়ে বেয সিকিউরিটি পুলিশকে খবর দেবার চেষ্টা করবে তুমি। তুমি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে কাভার করব। ভাগ্য ভাল থাকলে ওরা কেউ খেয়াল করবে না তুমি বেরিয়ে গেছ।'

'বরং আমি থাকি।'

'ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওদের?'

'না। মনে হয় পারব না।'

'তা হলে যা বলছি করো।'

'না, রানা। আমি হয়তো কোনও সাহায্যে আসব।'

'তুমি না গেলে সূর্য ওঠার আগেই আমরা দু'জন লাশ হয়ে যাব। যা বলছি করো। এটাই আমাদের বাঁচার একমাত্র সুযোগ। সূর্য উঠলে স্পষ্ট দেখতে পাবে ওরা আমাদের। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলবে। তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

খানিক চুপ করে থাকল সামান্থা, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি।'

গুহার এক ধার দিয়ে সামান্থা বের হতেই আগের চেয়ে দ্রুত গুলি ছুঁড়তে শুরু করল রানা। অন্তত ছয়টা জায়গায় নিয়মিত গুলি পাঠাচ্ছে। ওখানে লুকিয়ে আছে রাইফেলধারী আততায়ীরা, মাঝে মাঝেই সুযোগ বুঝে গুলি করছে। গুড়গুড় একটা আওয়াজ শুনতে পেল ও। ওর পিঠের উপর খসে পড়ল একরাশ বালি আর ছোট পাথরের খণ্ড। পাল্টা গুলি করল রানা, গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় এম-১৬-এর স্লাইডটা হাঁ হয়ে খুলে গেল। শেষ গুলিটাও শেষ! রাইফেলটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক টানে শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করে গুলি করতে শুরু করল ও মাযল ফ্ল্যাশগুলো লক্ষ্য করে।

আধমিনিট পর ম্যাগাযিন খালি হয়ে গেল ওয়ালথারের। ওটা হোলস্টারে রেখে দিয়ে স্টিলেটো বের করল রানা, গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বামদিকে আড়াআড়ি সরে যেতে শুরু করল।

পাঁচ ফুট যেয়েই থামতে হলো ওকে। ওর সামনের পাথরে অর্ধবৃত্তাকারে মাথা খুঁড়ছে .২২৩ বুলেট। একটা সীমান্ত সৃষ্টি করেছে রাইফেলধারীরা। ওটা পার হওয়া সম্ভব নয়। এতক্ষণে

ওর মারা যাবার কথা, কিন্তু কোনও কারণে লোকগুলো ওকে ... করছে না। থমকে গেল রানা, তারপর স্টিলেটো খাপে ... মাথার উপর দু'হাত তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ অপে... করতে হলো না, ঢাল বেয়ে এগিয়ে আসতে শুরু ... লোকগুলো। পেশাদারী দক্ষতায় একদল আরেকদলকে ... করছে। পাঁচফুট দূর থেকে ঘিরে ফেলা হলো রানাকে।

'মিস্তার রানা,' হাসিহাসি একটা গলা শুনতে পেল ... হলো কোলা ব্যাঙ ডাকছে। ওকে ঘিরে রাখা দু'জনকে ... দেখা দিল লোকটা। 'হাউ দু ইউ দু!'

ঘাড় ফিরাল রানা। চমকে উঠল ভিতরে ভিতরে। ... হান! এর ডোশিয়ে পড়েছে ও। বিকৃত-মস্তিষ্ক নিষ্ঠুর এ... মাথার ধূর্ত খুনি, তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্সের প্রথম ... এজেন্ট। বলা হয় সে-ই সেরা। পারত পক্ষে নিজের হা... করে না সে। ওতে নাকি তার মন ভরে না। যাকে খুন করা... সে খুন হয়ে যাবে এমন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে। ভঙ্গিটা ... বাঁচার সুযোগ এখনও রইল তোমার, পারলে বাঁচো!

ইঁদুর-বিড়াল খেলে লোকটা। সে সবসময় বিড়াল।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। এ-লোক এখানে কী করছে? তা কি তাইওয়ানিজরা প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনকে সাবো... করছে? কীসের আশায়? লেযার সুইচ? প্রজেক্টের ভিতরের ... কে?

'কী ভাবছেন?' ভ্রূ নাচাল লী তাই হান। 'জানি খুব চিন্... মানুষ আপনি, কিন্তু এত চিন্তা দিয়ে কী হবে? আপনাকে আমি একটু পরই চির চিন্তামুক্ত করে দেব।'

সময় পেতে হবে, বুঝতে পারছে রানা। সামান্থা যদি ... পাওয়ার টেস্ট স্টেশনে পৌঁছতে পারে, তা হলে সিকিউ... পুলিশ নিয়ে ফিরে আসতে হয়তো দশ মিনিটও লাগবে না

'প্রজেক্টের ভিতরে কার সাহায্য পাচ্ছ তোমরা?' জিজ্ঞেস রানা।

রানা। 'কে খুন করেছে ডক্টর আলী আহমেদকে? চাইনিজ মিলিটারি স্যাটেলাইট ফেলে দেয়ার বুদ্ধিটা কি তোমার?'

'মরবেন জানেন, তা-ও এতো জ্ঞানপিপাসা?' হাসল হান। 'ওস, মিস্তার রানা। আপনার মতো চিন্তাশীল লোক আর হয় না। হ্যাঁ, ভিতরে আমাদের লোক আছে তার পরিচয় বলে কী হবে, আপনি নিজে যখন বের করতে পারেননি সে কে। আর স্যাটেলাইট? স্যাটেলাইট ফেলে দেয়ার আগে পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত ছিলাম না জিনিসটা কাজের। ওই স্যাটেলাইট আমাদের ওপর স্পাইংএ কাজে লাগাত রেড চায়না। ওটা ধ্বংস হওয়ায় এখন আমরা জানি, লেযার ক্যানন আমাদের চাই। সর্বক্ষণ রেড চায়নার মিসাইল অ্যাটাকের ভয় দূর করতে হলে এমন জিনিস আর হয় না। তাইওয়ানের পার্লামেন্টের বেশির ভাগ মেম্বারই স্বাধীনতা চায় না। গণচিনের প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর আক্রমণকে ভয় পায় বলে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে একত্রীকরণ চায়। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বাছাই করা বিশেষ গ্রুপ। আমরা স্বাধীনতা চাই। চিনের আক্রমণ ঠেকাবার ক্ষমতা আছে জানলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে; নইলে যে-কোনও মুহূর্তে অনাস্থা প্রস্তাব তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারে। কাজেই লেযার ক্যাননের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি। তাঁর নির্দেশে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি আমরা।'

ঘড়ি দেখতে ইচ্ছা হলো রানার। কয় মিনিট হলো সময় গেছে? পাঁচ মিনিট?

'আর ডক্টর আহমেদের মৃত্যু?'

'ওটা একটা অনভিপ্রেত ঘটনা, মিস্তার রানা। তিনি যদি অডজার্ভেশন বাঙ্কারে থাকতেন, তা হলে মরতেন না। আমরা শুধু লেযার সুইচটা চাই। আমাদের লোককে উনি দেখে ফেলেন, ফলে তাঁকে না মেরে আমাদের এজেন্টের আর কোন উপায় ছিল না। ভেরি আনপ্রফেশনাল অভ হিম। লেযার সুইচটা খুলে না নিয়েই

বেরিয়ে আসে সে বাঙ্কার থেকে।' নাকে আঙুল পুরে কালো তেলতেলে ময়লা বের করল হান, চোখের সামনে হাত এনে কী বের করেছে দেখে নিয়ে দু'আঙুলে টিপে টিপে ওটাকে বল বানাল, তারপর ছুঁড়ে দিল একদিকে। রানার চেহারায় ঘৃণার ছাপ দেখে হাসিতে প্রায় বুজে এলো তার সরু চোখ। 'একবার চিন্তা করে দেখুন, মিস্তার রানা, কে ভাবতে পারবে আমেরিকার বন্ধু তাইওয়ান এমন একটা কাজ করতে পারে? রাশিয়া আর চীনের ওপর গিয়ে পড়েছে মাথামোটা গাধাগুলোর সন্দেহ। ফাঁক তালে আমরা কাজ বাগিয়ে নিচ্ছি।' ভ্রূ নাচাল হান। 'কী ব্যাপার, মিস্তার রানা, আপনাকে অস্থির দেখাচ্ছে? এমন কি হতে পারে এখনও ভাবছেন আপনার আহত সঙ্গিনী সাহায্য নিয়ে ফিরবে?'

লোকটা ফাঁদে পড়া ইঁদুর নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলছে, বুঝতে পারছে রানা। অসহায়ত্ব ওকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

'মিস্তার রানা, আপনার সঙ্গিনী গুহা থেকে বের হবার পর মিনিট পরই ধরা পড়ে গেছে। আমার লোকরা তাকে ... পাওয়ার টেস্ট স্টেশনে নিয়ে গেছে। ওখানে কোন গার্ড ... না। প্রয়োজনীয় গোপন কোন প্রজেক্ট নয় ওটা। তো ... মিস্তার রানা, আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে সেখানে। ... ধারণা আমার এক্সপেরিমেন্ট আপনারও পছন্দ হবে। আসুন ... করতে করতে যাই।'

পাঁচটা রাইফেলের নল রানাকে পিছন থেকে খোঁচা ... আগে আগে চলেছে লী তাই হান। টিলা পেরিয়ে গেল ... সামনে বাদামী মরুভূমি। সূর্য ওঠেনি এখনও, তবে ... মেঘের গায়ে ধূসর রঙের ছোঁয়া লেগেছে। রাতের সেই ... কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসটা আর নেই, এখন ঝিরঝিরে কোমল ... বইছে।

রানা হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর আহমেদের ... আমি এসেছি সেটা জানলে কী করে?'

বলল লী তাই হান। 'সিআইএ ফুটোয় ভরা, মিস্টার রানা। আমাদের একজন ডাবল এজেন্ট জানিয়েছে আপনি আসছেন। প্রথম থেকেই আমরা জানতাম ব্যান্ডেজের তলায় কে আছে।'

'প্রথমদিন আমাকে অনুসরণ করা হয় একারণেই?'

'হ্যাঁ।'

'আর আজ রাতে ডক্টর রিচার্ডের বাড়ির সামনে থেকে ওঁর গাড়িটা নিয়ে যায় কে?'

'আমাদের আমেরিকান বন্ধু। পরিকল্পিত ভাবে আপনাকে এদিকে টেনে আনে। ব্যাপারটাকে সে চ্যালিঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল। আমার সঙ্গে বাজি ধরেছিল আপনি বোকামি করবেন। দুঃখের বিষয়, বাজিতে হেরে গেছি আমি।'

চুপ করে গেল রানা।

'ওই উঁচু টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, মিস্টার রানা? ওটাকে বলে পাওয়ার টাওয়ার। ওটাকে ঘিরে আছে ফ্রেসনেল লেন্সের সারি। ওগুলো সূর্যকে ট্র্যাক করে। সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে স্ট্রাকচারটার নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। ওখানে বিরাট একটা বয়লার আছে। ভিতরের পানি বাষ্পে পরিণত হয় ওটাতে। সেই বাষ্প টারবাইন ঘোরায়। ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। চলুন, জিনিসটা কাছ থেকে দেখি।'

রানাকে একটা জীপে উঠতে ইশারা করল লী তাই হান। পিছনে উঠে বসল এম-১৬ ধারী তিন গার্ড। রানা কিছু করবে সে উপায় নেই। ওর খুলিতে ঠেকে আছে তিনটে এম-১৬-এর মাযল।

দক্ষ হাতে গাড়িটা চালাচ্ছে ড্রাইভার, একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতই পৌঁছে গেল ওরা বারো তলা উঁচু স্তম্ভটার কাছে। দূর থেকে দেখে বোঝা যায়নি জিনিসটা কতখানি বড়।

'এলিভেটর আমাদের ওপরে নিয়ে যাবে, মিস্টার রানা,' বলল হান, হাসছে কর্কশ আওয়াজ করে। 'ওখানে মিসেস আহমেদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

দু'জন গার্ড ঠেলা দিয়ে রানাকে এলিভেটরে ঢোকাল। আরেকজন ওর আগেই ঢুকেছে এলিভেটরে। লিফটের ভিতরের কন্ট্রোল প্যানেলের উপরটা ভেঙে রিওয়্যারিং করা হয়েছে। কেন তা বুঝতে পারল না রানা। তবে আন্দাজ করল, কারণটা শীঘ্রি জানা যাবে। লী তাই হানের ভোশিয়ে বলে, লোকটা বিনা কারণে কোন কাজ করে না বা করায় না।

এলিভেটরের ঊর্ধ্বগতির কারণে রানার মনে হলো হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়বে। সারারাত মরুভূমির মাঝে ধাওয়া খাওয়ার পরিশ্রম এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও, তবু মুক্তির সুযোগ খুঁজছে। স্টিলেটো ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে। ওয়ালথারটা গুলিশূন্য, কোন কাজে আসবে না। স্টিলেটো ব্যবহার করার সুযোগ নেই। গার্ডরা সবাই অনেক বেশি সতর্ক। তিনজনই সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ওর উপর।

'এই যে এসে গেছি আমরা, মিস্তার রানা। বলা যায় দুনিয়ার ওপরে চলে এসেছি। সূর্য আর মাত্র এক ধাপ দূরে।'

ভোরের আবছা আলোয় দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বারো তলার ছাদে বসানো বিশাল লেন্সগুলো সূর্য ঠিক যেখানে উঠবে সেদিকে তাক হচ্ছে। ওগুলোর পিছনে আয়নার সারি রানা যেখানে দাঁড়ানো সরাসরি সেদিকে ঘোরানো।

'হ্যাঁ, মিস্তার রানা, আর পনেরো মিনিট পরই সূর্যের কোমল আলোয় প্লাবিত হবে পুরো এলাকা। শুধু এখানে তাপটা হবে বহুগুণ বেশি। ধরুন কমপক্ষে এক হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট। তবে তাতে আপনার বা আপনার সঙ্গিনীর কোনও অসুবিধে হবে না। যদি সূর্য ওঠার আগেই নিজেদের মুক্ত করতে না পারেন, তা হলে আপনারা ভাল করে কিছু টের পাবার আগেই পাউডারের মতো ছাই হয়ে যাবেন। জানেন তো, আমি আবার মানুষের কষ্ট সইতে পারি না।'

লী তাই হানের কথা শেষ হবার আগেই পিছনের গার্ডের

হাঁটুতে জুতোর গোড়ালি দিয়ে গায়ের জোরে গুঁতো মারল রানা। বিশ্রী একটা আওয়াজ হলো হাঁটুর কাপ সরে যাওয়ায়। আর্তচিৎকার করে কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। থেমে নেই রানা, এক পাশে সরতে শুরু করেছে ও, একটা রাইফেল কেড়ে নেওয়ার মতলব। সরতে শুরু করেই মাথার পাশে লী তাই হানের প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেল। ব্যথাটা তীব্র, কিন্তু ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে আবার লাথি চালাল রানা। এবার সামনের গার্ডের তলপেটে। দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল লোকটা। রানা তার রাইফেলটা তুলে নেওয়ার আগেই তৃতীয় গার্ড নিজের রাইফেলটা লাঠির মত ধরে রানার হাঁটুতে বাড়ি মারল। বসে পড়তে পড়তে সামলে নিল রানা। কিন্তু আসলে ওকে ঠেকাল লী তাই হান। এক ঝটকায় একটা বিরাট মাউজার পিস্তল বের করে নিষ্কম্প হাতে রানার মাথায় তাক করল সে। মাযলের কালো ফুটোটা সামনে থেকে দেখে কামানের নল বলে মনে হলো রানার। আস্তে আস্তে মাথার উপর হাত তুলল ও।

'কোন বোকামি নয়, মিস্তার রানা। অ্যালবাকার্কিতে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তা ছাড়া, আপনার ব্যবস্থা করার জন্যে যে-সময় রেখেছিলাম, তা-ও শেষ হয়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমার গার্ডরা আপনাকে বেঁধে ফেলুক।'

অসহায় বোধ করল রানা। মাথায় গুলি খেয়ে এখনই মরতে পারে ও, অথবা নিজেকে বাঁধতে দিয়ে আরও কয়েক মিনিট বেশি বাঁচার চেষ্টা করতে পারে। সেটাই করবে ঠিক করল। যদি কোন সুযোগ পাওয়া যায়।

ওর দু'হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল তৃতীয় গার্ড। শোয়ানোর পর পায়ে আরেকটা চেইন জড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে ফেলে রাখা হলো ওকে।

'মাতারিটাকে আনো।'

ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসা হলো সামান্থাকে। বিপর্যস্ত চেহারা.

চুলগুলো আগোছাল আর ময়লা। কপালের কাটা খুলে আবার রক্ত পড়ছে, বাম চোখের কোণ বেয়ে দরদর করে নামছে। ডান গালে কুৎসিত একটা দাগ। বোধহয় চড় মারা হয়েছিল। হাত দুটো নির্জীবের মত ঝুলিয়ে রেখেছে।

'তোমাকেও ধরে এনেছে?' হতাশ শোনাল সামান্থার গলা 'আমি ভেবেছিলাম...' কথা শেষ করল না সে।

'এবার শোনো, মেয়ে, কী ঘটবে,' বলল লী তাই হান। 'সূর্য উঠলেই লেন্স থেকে তাপ প্রতিফলিত হবে আয়নায়। বিশেষ ভাবে তৈরি আয়নাগুলো সেই তাপ পৌঁছে দেবে ঠিক এখানে।' স্টিলের প্ল্যাটফর্মটা দেখাল সে। 'তোমরা দু'জনই ছাই হয়ে যাবে। কি চমৎকার ব্যাপার, না? কোন পরিবেশ দূষণ নেই।' রানার দিকে তাকাল সে। 'মিস্তার রানা, সত্যি বলছি, আপনার মৃত্যু আমার ক্যারিয়ারে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। নিজেকে আমার সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। গুপ্তচরদের কিংবদন্তী মাসুদ রানা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কে করল? লী তাই হান।'

কড়া এক নির্দেশ দিতেই সামান্থাকে বেঁধে ফেলা হলো শুইয়ে দিয়ে তার পায়েও চেইন জড়াল গার্ড। এবার আহত গার্ডদের এলিভেটরের দিকে যাবার জন্য ইশারা করল লী তাই হান, নিজেও সেদিকে পা বাড়াল। সুস্থ গার্ডের সাহায্য নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলিভেটরে চড়ল আহত দুই গার্ড।

বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা, নীচে নামছে।

'যা বলল সেটা কি সত্যি, রানা?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা 'ওই আয়নাগুলো কি সত্যি...'

'হ্যাঁ,' বলল গম্ভীর রানা। 'সূর্য উঠলেই।' অজান্তেই ওর চোখ চলে গেল পুব দিগন্তে। ওদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মারবে সূর্য, শুরু হবে ওদের শেষ হয়ে যাওয়া। 'শান্ত থাকো, সামান্থা। এখনই হাল ছেড়ে দিয়ো না।' কব্জির মোচড়ে ওর হাতে বেরিয়ে এলো স্টিলেটো। ওটার ডগা দিয়ে এরকম সাধারণ তালা

খোলাও প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ওকে যেভাবে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছে তাতে হাত প্রায় নাড়তে পারছে না বললেই চলে। পাতলা একটা ধাতব নমনীয় পাত দরকার হবে তালা খুলতে। শামুকের গতিতে খানিকটা পিছনে সরে স্টিলেটো দিয়ে পেটমোটা বয়লারের গায়ে আঁচড় মারতে শুরু করল রানা। গায়ের জোরে চাপ দিচ্ছে। এধরনের বয়লারে দুটো আস্তরণ থাকে। এটারও কি আছে? না থাকলে ওর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কয়েক মিনিট পর লম্বাটে একটা পাতলা খণ্ড চিরে দিতে পারল ও স্টিলেটো দিয়ে। টুকরোটা বয়লারের গা থেকে খুলে আনতে গিয়ে আঙুল কেটে গেল।

'কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তি পেয়ে যাব আমরা,' রানার মনে হলো নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। বাম হাতের হ্যান্ডকাফের তালায় সরু ধাতব পাতটা ঢুকিয়ে দিল ও, নেড়েচেড়ে টাম্বলার খুঁজছে।

কিন্তু কয়েক মিনিট সময় আসলে নেই হাতে। পুবাকাশে এইমাত্র মুখ তুলেছে সূর্য। সারা শরীরে কড়া তাপ অনুভব করল রানা।

দ্রুত কাজ করছে ও। আঙুলগুলো ঘামে ভিজে উঠেছে। বাম হাতের তালায় ক্লিক ক্লিক আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, তালাটা খুলতে আর বেশি দেরি নেই। আরেকদফা তাপ প্রবাহে ভ্রূ পুড়ছে টের পেল ও। কট্ করে খুলে গেল তালা। এবার সহজেই নিজেকে মুক্ত করতে পারবে ও, কিন্তু সামান্থাকে সরিয়ে নেওয়ার সময় নেই হাতে।

পাহাড়ের ওপাশ থেকে আরও খানিকটা উঠে এসেছে সূর্য। ওটার সামনে কালচে মেঘ ভেসে আসতে দেখে মুহূর্তের জন্য ভাগ্যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো ওর। হাতে বাড়তি কয়েকটা সেকেন্ড এনে দিয়েছে ওই মেঘগুলো।

লাথি দিয়ে পায়ে জড়ানো চেইন খুলে দ্রুত পায়ে সামান্থার পাশে চলে গেল ও। মেঘ সরে যাচ্ছে সূর্যের সামনে থেকে। যে-

কোন সময় তীব্র তাপ এসে পড়বে প্ল্যাটফর্মের উপর। সামান্থার পায়ের চেইনটা সরিয়ে দিয়ে হ্যাঁচকা টানে ওকে কাঁধে তুলে নিল রানা, ঝট করে সরে গেল প্ল্যাটফর্মের পাশ থেকে। তিন সেকেন্ড পর ওর কয়েক ইঞ্চি দূরে আলোর একটা বর্শা স্টিলের প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল। র‍্যাডিয়েশনের কারণে রানার শিশিরে ভেজা শরীর থেকে বাষ্প উঠতে শুরু করল। সামান্থার পায়ের চেইনটা প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে ছিল, কয়েক সেকেন্ড পর ওটা লাল তরলে পরিণত হলো। স্টিলের প্ল্যাটফর্মও গনগনে তাপে লাল হয়ে গেছে। একটু পরই ওটা আরও উত্তপ্ত হয়ে সাদা রং ধরবে।

প্ল্যাটফর্মের কাছ থেকে আরও সরে গিয়ে ডান হাতের তালা খুলতে ব্যস্ত হলো রানা, তালাটা খুলতে পারার পর সামান্থার হাতের তালাগুলো খুলতে খুব একটা সময় লাগল না।

'চলো, যাওয়া যাক,' ক্লান্ত স্বরে বলল ও।

ওর কাঁধে ভর দিয়ে ফোঁপাচ্ছে সামান্থা। এলিভেটরের দিকে চলে এলো ওরা। লী তাই হান কারিগরী ফলিয়ে গেছে ওটায়, বাটন টেপার পরও উপরে এলো না এলিভেটর। অবশ্য মেইনটেন্যান্স রাঙ শ্যাফটের ভিতর দিয়ে নেমে গেছে। ওটা করেও নামা যাবে। ওটাই ব্যবহার করল ওরা।

সাত

সকাল সাড়ে দশটা। আধঘণ্টা আগে পাঁচ মাইল হেঁটে তবে ট্যাক্সি পেয়েছে ওরা। পনেরো মিনিট হলো বাড়ি ফিরেছে। নাস্তা

টেবিলে এখন বসে আছে রানা আর সামান্থা।

মনে মনে দ্বিতীয় লেখার সুইচটা কীভাবে সরাবে ভাবছে রানা। ওটা নিয়ে বের হতে গিয়ে ধরা পড়লে সর্বনাশ হবে। তারচেয়ে নিরাপদ ওটা ধ্বংস করে দেওয়া। যদিও তাতে ওর মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট সফল করতে হলে কাজটা করতেই হবে। সেজন্য প্রজেক্ট সিক্রেট ইলেভেনের কম্পাউন্ডে ঢুকতেই হবে ওকে।

রানাকে নীরব দেখে সামান্থা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ধারণা ডক্টর রিচার্ডই স্পাই? তিনিই খুন করেছেন অ্যালিকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওই গাড়ির রেসের পর এখন আর তা ভাবতে পারছি না। তুমি যখন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছিলে তখন ফোনে সিআইএ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ডগলাস র‍্যাকাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, আমার প্রশ্নের জবাবে সে জানাল ডক্টর রিচার্ড পুলিশে রিপোর্ট করেছেন, তাঁর বাড়ির সামনে থেকে গাড়িটা কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মাতাল হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি, কিছু টের পাননি। তা ছাড়া, তাঁর বাড়ির সামনে এনভেলপ আদান-প্রদানের ব্যাপারটা মেলে না। তা ছাড়া, ওরকম গাড়ির রেস তাঁর মতো অ্যালকোহলিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি গাড়ি চালাননি সেটা স্ত্রী তাই হানও বলেছে। এসবের সঙ্গে সম্ভবত ডক্টর রিচার্ডের আসলে কোন সম্পর্কই নেই।'

'আমি আজকে আর অফিসে যাব না,' নাস্তা শেষে জানাল সামান্থা।

উঠল রানা। 'আমি বিকেলে ফিরব।' সামান্থার গাড়ির চাবিটা চেয়ে নিল ও, ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় হাজির হয়ে গেল প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেনের গেটে। সাধারণ পরীক্ষা শেষে ওকে ঢুকতে দিল গার্ড। এখন রানা জানে কোথায় যেতে হবে। সোজা 'নিজের' ল্যাবে চলে এলো ও, দেখল নিনা কম্পিউটারের সামনে বসে আধমাইল দূরের মেইন কম্পিউটারে ডাটা ইনপুট করছে।

'হাই, নিনা।' ব্যান্ডেজের কারণে অস্পষ্ট শোনাল রানার কণ্ঠ। আজকে হাতের তালু ব্যান্ডেজ করেনি ও। দরকার মনে করেনি। কেউ যদি খেয়াল করে হাতটা অন্যরকম লাগছে, তা হলেও আগুনে পুড়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা একজনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে বলে মনে হয় না। তালুতে ব্যান্ডেজ থাকলে ওয়ালথারটা দ্রুত বের করতে পারবে না ও।

মুখ তুলে হাসল নিনা। 'কেমন আছেন, ডক্টর?'

'ভাল।' নিনার আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা দেখল না রানা। সন্দেহভাজনদের লিস্টি থেকে নিনা হাডসনের নামটা কেটে দিল ও।

'আজ রাতে বড় টেস্টটা করা হবে। আপনি দেখার জন্য থাকবেন তো?'

'বড় টেস্ট? কোন্‌টা যেন? ঠিক মনে করতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরে অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি।'

'কেন, গ্রিন রিভার টেস্ট! আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার, সার। এতো জরুরি একটা টেস্টের কথা ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক নয়।'

জবাব না দিয়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ বুলাল রানা। এ… মরুভূমির আকাশে সত্যিকারের একটা মিসাইলের উপর লেসার কামান পরীক্ষা করে দেখা হবে।

'সন্ধে ছয়টা তিরিশে টেস্ট, সার। স্টেট পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি, ওই সময়ে কেউ ইউএফও দেখেছে রিপোর্ট করলে হু… হবে না তাদের। লেযার ক্যাননা যদি আঘাত হানে তা হলে রাতের আকাশে বিরাট অগ্নিকুণ্ড দেখা যাবে। ওয়ারহেডে ম্যাগনেশিয়াম ভরা আছে, যাতে ঠিক মতো লেযার আঘাত করল কি না তা সহজেই বোঝা যায়।'

লেযার ক্যাননা কতখানি নিখুঁত তা নিয়ে বকবক করল নিনা। এই প্রজেক্টে সাহায্য করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবা…

মনে করছে। মহিলা বিশ্বাসভাজন, মনের প্যাডে আরেকটা নোট নিল রানা। এত নিবেদিতপ্রাণ কেউ বিক্রি হয়ে যাবে সেটা সম্ভব নয়।

ল্যাবের একটা চেয়ারে বসল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন ডক্টর রিচার্ড হ্যান্স আর অ্যাডাম ব্রিল। ঢুকে রানাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন ডক্টর রিচার্ড, তাঁর গায়ে হোঁচট খেলেন অ্যাডাম ব্রিল। 'সরি,' মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। রানার দিকে তাকালেন। 'কী খবর?'

'ভাল। আপনার খবর কী?'

'চলছে।'

ডক্টর রিচার্ডের দিকে তাকাল রানা। 'আর আপনার, ডক্টর রিচার্ড? আপনাকে দেখে বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে।'

'না, ঠিক আছি। আসলে টেস্টের কথা চিন্তা করে মনের ওপর চাপ পড়ছে।' একটু থামলেন ডক্টর রিচার্ড, তারপর বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আজকে আপনি আর আসবেন না।'

ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকাল রানা। 'তাই? কেন?'

'আসলে তেমন কোন কারণ নেই। আপনার ওই দুর্ঘটনা, তারপর বাঙ্কারের সমস্যা–এসব কারণে ভাবছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে সুস্থ আছেন আপনি।' হাতের ইশারা করলেন ডক্টর রিচার্ড। 'আসুন, ডক্টর আহমেদ, আজকের টেস্ট নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আপনিও আসুন, ডক্টর ব্রিল।' ঘুরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রানার পাশে তাঁকে অনুসরণ করলেন ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল। 'পোড়া ক্ষতগুলো সমস্যা করছে, ডক্টর? আমি শুনেছি খুব নাকি কষ্ট দেয়।'

'খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না,' জানাল রানা। 'ব্রুক আর্মি হসপিটাল ভাল চিকিৎসা করেছে। এখন আঙুলগুলোও ব্যবহার করতে পারছি।'

বেশি কথা বলার ইচ্ছা নেই ওর, সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে ধরা পড়ে যাবে।

প্রায় টলতে টলতে ছোট একটা লেকচার রুমে ঢুকলেন ডক্টর রিচার্ড। সবাই বসার পর শুরু করলেন, 'সেটআপটা এরকম। মি রিভার থেকে একটা ক্রুজ মিসাইল ছোঁড়া হবে। দুশো মাটির ওপরে উঠে যাবে ওটা, তারপর টার্গেট লক্ষ্য করে নামতে শুরু করবে। আমাদের সেনসরে ওটার প্রথম ফ্রিকশন ধরা পড়লেই লেযার লক হয়ে যাবে, তারপর ট্র্যাকিং শুরু করবে।'

'হিট ট্র্যাক করবে?' একটু আগে নিনার কম্পিউটারে দে- আসা তথ্য আউড়াল রানা। 'রাডার ট্র্যাকিং নয় কেন?'

মুহূর্তের জন্য কৌতূহলের ছাপ পড়ল ডক্টর রিচার্ডের চেহারায়, তারপর বললেন, 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন এখন- স্যাটেলাইট সিস্টেম নেই আমাদের।'

'ডক্টর আহমেদ ঠিকই বলেছেন,' রানাকে সমর্থন করলেন ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল। 'তিনি কী বলতে চেয়েছেন আমি বুঝতে পারছি। সবচেয়ে ভাল হত ইনফ্রারেড ব্যবহার করা- মাইক্রোওয়েভ লিঙ্কেজ হয়তো জরুরি মুহূর্তে ফেইল কর- পারে। শুধু স্যাটেলাইট বেযড রাডার ইউনিট থাকলে ত- আমরা সর্বক্ষণ অগ্রসরমান অবজেক্ট সনাক্ত করতে পারব। গ্রা- বেযড় রাডার ইউনিট দিতেও গড়িমসি করছে মিলিটারি।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল রানা, ত- বেশি কিছু বলার কোনও ইচ্ছা নেই।

রানার দিকে তাকিয়ে বকবক শুরু করলেন ডক্টর রিচা- 'সাইকেল ফাইভে লেযার সেট করেছি আমরা। প্রথমবার য- কোন কারণে লেযার টার্গেট ফেইল করে, তা হলে আপনার ন- সুইচটার কারণে প্রায় বিরতিহীন ভাবে আরও চারবার লেয- ছুঁড়তে পারব।' চক দিয়ে বোর্ডে একটা ক্রস আঁকলেন ডক- রিচার্ড। 'সেক্ষেত্রে লেযার প্রক্ষেপণের সময় তিনগুণ বেড়ে যাবে

শুধুমাত্র ফুটো না করে মিসাইলটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে লেযার।'

যেভাবে কথা বলছেন ডক্টর রিচার্ড, তাতে সন্দেহের খাতা থেকে তাঁকেও বাদ দিতে হবে বলে মনে হলো রানার। অ্যালকোহলিযম আর জুয়ার বদভ্যেস বাদ দিলে ভদ্রলোক প্রজেক্টের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত। গলার আওয়াজে গর্ব ফুটে উঠছে তাঁর। আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলছেন। তবু, মদ্যপান আর জুয়ার নেশা হয়তো তাঁকে তাইওয়ানিজদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করেছে!

কিন্তু ডক্টর আলী আহমেদকে খুন করা? সেটাও কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল?

'হোয়াইট স্যান্ডে ক্রুজ মিসাইলের সঙ্গে লেযার ইমপ্যাক্ট হবে। মিসাইলের অবশিষ্ট অংশ দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক সপ্তাহের আগেই মেটালার্জিকাল পরীক্ষার পুরো ফলাফল রিপোর্ট করতে পারব আমরা। বীম যেখানে প্রথম হিট করবে সেখানে ক্রিস্টালাইযেশন যা হবে সেটা সত্যি পরখ করে দেখার মত একটা ব্যাপার।' রানার দিকে তাকালেন ডক্টর রিচার্ড। 'আপনি মেটারিয়াল ক্যারাকটারাইযেশন পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন, ডক্টর আহমেদ, নাকি আমি দেখব?'

'আমিই পারব,' কী ব্যাপারে কথা হচ্ছে তার কিছু না বুঝলেও ব্যান্ডেজে আবৃত রানার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন অ্যাডাম ব্রিল। 'ডক্টর রিচার্ড, একটা প্রশ্ন। 'আবহাওয়া পরিমণ্ডলের ওপরের অংশের তাণ্ডবে লেযার বীম সরু হয়ে যাবে। আমি ভাবছিলাম...'

ডক্টর ব্রিল এমন সব প্রসঙ্গ টানলেন যে গোটা ব্যাপারটা রানার মাথার অনেক উপর দিয়ে গেল। চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে রইল ও, মনে মনে প্রার্থনা করল, ওর পরামর্শ যাতে না চায় দুই বিজ্ঞানী।

রানাকে উদ্ধার করল নিনা। পাশের দরজায় এসে দাঁড়াল তখন সে, 'এক্সকিউয মি, ডক্টর রিচার্ড। ডক্টর আহমেদের সঙ্গে একটুখানি কথা বলতে চাই। জরুরি।'

ডক্টর রিচার্ডের চেহারা দেখে মনে হলো রানা না থাকলে খুশিই হবেন। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে যেতে ইশারা করলেন তিনি। পরমুহূর্তে ডক্টর ব্রিলের সঙ্গে জটিল ফর্মুলার অঙ্ক কষায় মন দিলেন চকবোর্ডে।

'পুরো কোর্সটা বুঝছেন তো?' লেকচার রুম থেকে বেরিয়ে খানিক দূরে গিয়ে প্লাস্টিকের দেয়ালে হেলান দিল নিনা। মেয়েটার দু'চোখে ভয় আর কৌতূহল খেলা করছে।

'আমার অফিসে চলো,' বলল রানা। 'এসব ব্যাপারে হলওয়েতে কথা বলতে চাই না।' যে-কেউ শুনতে পারবে এখানে কথা হলে। ডক্টর ব্রিল আর নিনার প্রেমালাপ শুনতে ওর কোন অসুবিধে হয়নি।

অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর নিনার দিকে তাকাল রানা। 'কিছু একটা বলতে চাও তুমি, নিনা। বলে ফেলো।'

'আপনি ডক্টর আহমেদ নন!'

ধীরে ধীরে চেয়ারে বসল রানা। 'অ্যান ইন্টারেস্টিং অবযার্ভেশন। কেন তোমার মনে হলো এ-কথা?'

'আপনার হাত দেখে।'

'কেন? পুড়ে যায়নি ওগুলো। সামান্যের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে। চেহারার তুলনায় অনেক দ্রুত সেরেছে হাত।'

'আমি সেটা বোঝাতে চাইনি। আপনার হাতে যে চিহ্ন থাকার কথা, সেগুলো নেই!'

হাত দুটো দেখল রানা। শক্তিশালী পুরুষের হাত। দু'এক জায়গায় ছুরির পোচের চিহ্ন। অদ্ভুত শান্ত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর 'খুলে বলো কী বলতে চাও।'

'কয়েক মাস আগে আমি আর ডক্টর আহমেদ পাশের ল্যাবে

এক্স-রে জেনারেটর নিয়ে কাজ করছিলাম। থ্রী ফেয লাইন ছিল ওটার। দুশো বিশ ভোল্ট। ওটার প্লাগ না খুলে সেফটি ডিসকানেক্ট ডিভাইসের ওপর নির্ভর করেছিলেন ডক্টর আহমেদ। পাওয়ার লাইনের একটা অংশ শুধু ডিসকানেক্ট হয়েছিল। পুরো সার্কিটে তখনও ছিল একশো দশ ভোল্ট। একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট দিয়ে লাইনটা শর্ট করেন তিনি।'

'তো?'

'হাতের ওপরের অংশে গলন্ত অ্যালুমিনিয়ামের ছিটে পড়ে তাঁর। ওখানে ছোট ছোট অনেকগুলো ক্ষত তৈরি হয়। সেই জলবসন্তের দাগের মতো চিহ্নগুলো আপনার হাতে নেই। প্রথমে যখন খেয়াল করি তখন চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিই। কিন্তু পরে মনে হলো এ-ব্যাপারে আমাদের কথা হওয়া দরকার।'

'আর কাউকে তোমার সন্দেহের কথা বলেছ?'

মাথা নাড়ল নিনা। ডিম্বাকৃতি চেহারার উপর এসে পড়ল কয়েকটা সোনালী চুল। 'আমি ধরে নিই আপনি সরকারী লোক, কোন নিরাপত্তামূলক ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছেন। নইলে এত সিকিউরিটির পরও ভিতরে ঢুকতে পারতেন না কিছুতেই। ফিঙ্গার প্রিন্ট বা ভয়েস প্রিন্ট চেকের সময়েই ধরা পড়ে যেতেন।'

'ঠিকই ধরেছ,' স্বীকার করল রানা। 'আমাকে সরকারের তরফ থেকেই পাঠানো হয়েছে।'

'আর ডক্টর আহমেদ? তাঁর কী হলো?'

'মারা গেছেন। খুন করা হয়েছে তাঁকে।' নিনার চেহারায় নিখাদ বিস্ময় দেখল রানা। হয় বিরাট মাপের অভিনেত্রী, নয়তো বসের মৃত্যু সংবাদে চমকে গেছে মেয়েটা। 'এখনও পর্যন্ত ডক্টরের মৃত্যু-সংবাদ শুধু তাঁর স্ত্রী জানতেন। আমি চাই না তুমি ছাড়া এ-খবর আরও কেউ জানুক।'

'আর কেউ জানবে না,' প্রায় ফিসফিস করল নিনা। 'আমি মুখ বন্ধ রাখব।'

'গুড।'

'আমাকে কী করতে হবে বলুন। ডক্টর রিচার্ড এখন বেশ কিছুক্ষণ ডক্টর ব্রিলের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আপনি চাইলে আমি ডক্টর রিচার্ডের অফিসে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। ওঁর সেফের কম্বিনেশন আমার জানা আছে।'

অবাক হলো রানা। 'কীভাবে?' একমাত্র প্রজেক্ট ডিরেক্টর আর সিকিউরিটি চীফ জোনাথন হার্কারের জানবার কথা ওই কম্বিনেশন, আর কারও নয়।

'একদিন বেশি মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর রিচার্ড সেফের কাছে যেতে পারছিলেন না। আমাকে সেফের কম্বিনেশন লকের নাম্বার দিয়েছিলেন তাঁর হয়ে সেফ খুলতে। তার আগে আমাকে শপথ করান, যাতে কাউকে না বলি এ-কথা। পরে সম্ভবত গোটা ব্যাপারটাই তিনি ভুলে যান। নইলে সিকিউরিটি ক্রুদের দিয়ে নতুন কম্বিনেশন ইন্সটল করাতেন। এমনিতে তিনি সিকিউরিটির ব্যাপারে খুবই কড়া।' অপরাধের ছাপ পড়ল নিনার চেহারায়। 'কাউকে বলবেন না, প্লিজ। কথাটা সিকিউরিটিকে না জানানোর কারণে তাঁর মতোই আমিও সমান দোষী।'

ডক্টর হ্যান্সের সঙ্গে তাইওয়ানিজ লী তাই হানের কোন যোগসাজস আছে কি না সেটা হয়তো জানা যাবে তাঁর সেফ ঘাঁটলে। এটাও হয়তো জানা যাবে কীভাবে তারা লেযার সুইচটা সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তথ্যটা পাওয়া গেলে ওর কাজে আসতে পারে। এমনও হতে পারে, সত্যিই কোন উপায় আছে নিরাপদে লেযার সুইচ নিয়ে সরে পড়ার। উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, তাঁর অফিসে যাওয়া যাক।'

অফিসটা দোতলায়। এলিভেটরে করে নেমে এলো ওরা। লকপিক দিয়ে দরজার তালাটা খুলতে কোন সমস্যা হলো না রানার। সেফ খোলা হতেই নিনাকে বিদায় করে দিল ও। দেরি না করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাগজপত্র নিয়ে।

সিন্দুকের একেবারে নীচের ড্রয়ারে পেল একটা আধখালি কমদামি বুরবঁর বোতলের নীচে একগাদা কাগজ। কাজের সময়ও মদ্যপান করেন ভদ্রলোক। বোতলটা সরিয়ে রেখে কাগজগুলোয় দ্রুত চোখ বুলাতে শুরু করল ও। ব্যাঙ্ক থেকে ধারের পর ধার নিয়েছেন ডক্টর রিচার্ড। সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থও হয়েছেন বেশ কয়েকবার। জুয়ার ধার প্রায় আশি হাজার ডলার। আর কোথাও থেকে ধার নেওয়ার উপায় রাখেননি।

এটা তাঁর বিক্রি হয়ে যাবার একটা কারণ হতে পারে। নী তাই হান নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে লোক ভাড়া করেছে। হয়তো তার লোকজনই ডক্টর রিচার্ডকে জুয়ায় ফতুর করেছে, তারপর তাদের হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে।

ডক্টর রিচার্ডের ডাইরিটা গভীর মনোযোগে পড়তে শুরু করল ও। জুয়ার ব্যাপারে লোকটা কতখানি বেপরোয়া সেটা সহজেই বোঝা গেল কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে। মদ্যপানের কথাও বারবার লেখা হয়েছে। মনের উপর চাপ কমাতে মদ খেতে বাধ্য হন তিনি। আর মদ খেলেই তাঁর জুয়ার নেশা চাপে।

গুপ্তচরবৃত্তির কোন তথ্যপ্রমাণ সেফের ভিতর নেই। কোথাও লেযার সুইচের ব্যাপারেও কোন তথ্য পেল না ও। লোকটা খুব অসতর্ক না হলে অবশ্য এসব তথ্য থাকার কথাও নয়। এই সেফ সিকিউরিটি চীফও খুলতে পারবে।

দরজার কাছে খসখস আওয়াজ শুনতে পেয়ে মুখ তুলল ও। ফ্রস্টেড কাঁচের ওপাশে ডক্টর রিচার্ডের মোটাসোটা শরীরটা আবছা ভাবে দেখতে পেল। তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজটা স্পষ্ট।

ঘরে একটা জানালাও নেই। লুকাবার জায়গা নেই কোনও। রানা বুঝল, ধরা পড়তে যাচ্ছে ও।

খুলতে শুরু করল অফিসের দরজা।

আট

ঘরে দ্রুত চোখ বুলাল রানা। লুকানোর চেষ্টা করা যেতে পারে একমাত্র ডেস্কের তলায় পা রাখার চৌকো ফোকরটায়। কিন্তু ডক্টর রিচার্ড যদি ডেস্কে বসেন, তা হলে হাস্যকর ভাবে ধরা পড়ে যাবে ও। কিন্তু এ-ঘরে চোখে পড়তে না চাইলে আর কিছু করারও নেই।

হামাগুড়ি দিয়ে ডেস্কের পিছনে চলে এলো রানা, সাবধানে উঁকি দিল ডেস্কের উপর দিয়ে। ভাবছে, লোকটা এলে তার ওপর ডেস্কটা উল্টে ফেলে দিয়ে চোখের নিমেষে বেরিয়ে যেতে পারে ও। তবে তাতে কাজ হবে বলে মনে হলো না। মুখের সাদা ব্যান্ডেজ ওকে ধরিয়ে দেবে। ব্যান্ডেজ খোলারও উপায় নেই, ও ডক্টর আহমেদ নন সেটা জেনে যাবে সবাই।

তিন ভাগের এক ভাগ খুলল দরজাটা, ডক্টর রিচার্ডের ভুঁড়ির সামনেটা দেখতে পেল রানা। কী করবে ভাবছে তখনও, শুনতে পেল একটা পুরুষালী গলা। চিনতে পারল। ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল।

'ডক্টর রিচার্ড? এক মিনিট। আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

ডক্টর রিচার্ডের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন ডক্টর ব্রিল। ঘরে ঢুকতে সামান্য হলেও দেরি হবে প্রজেক্ট ডিরেক্টরের। চট করে সেফ বন্ধ করে আবার ডেস্কের পিছনে ফিরে এলো রানা। দুই বিজ্ঞানী কী বলেন শুনতে কান খাড়া।

'আমি সাইকেল টাইমের কথা ভাবছিলাম। ডক্টর আহমেদের

ওই সুইচটার বোধহয় বাড়তি শক্তি আর...'

থামিয়ে দিলেন ডক্টর রিচার্ড। 'আপনি এখনও ওঁর কালো ওই বাক্সটা খুলে ভিতরে কী আছে দেখতে চান, তা-ই না, ডক্টর ব্রিল?'

'অবশ্যই,' স্বীকার করলেন ব্রিল। 'লেযার ক্যাননের ব্যবহৃত বিপুল বিদ্যুৎ সামলে নেয় এমন একটা সলিড সুইচিং ডিভাইস উনি কীভাবে তৈরি করলেন সেটা এখনও আমার মাথায় ঢোকে না। যদি ভিতরের সার্কিটটা পেতাম, তা হলে রিচ্যানেলিং করতাম; যাতে ডিসচার্জে ইলেকট্রিসিটি কম নষ্ট হয়। আমার ধারণা লেযার ক্যাননের কর্মক্ষমতা দ্বিগুণ করে ফেলতে পারতাম। ডক্টর আহমেদ আমাদের কাছে জিনিসটা তৈরির কৌশল লুকিয়ে ন্যায্য কাজ করছেন না। তাঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে? সিকিউরিটি চীফ কথায় কথায় সেদিন বলছিলেন ডক্টর আহমেদ সুইচের ব্যাপারে কোন তথ্যই কম্পিউটারে জমা রাখছেন না।'

'ডক্টর আহমেদের হয়নি কিছু। তা ছাড়া, সময় হলে তিনি নিশ্চয়ই নিজের আবিষ্কারের ফর্মুলা জমা দেবেন।'

'কিন্তু বাঙ্কার বিস্ফোরণে তিনি মারা যেতে পারতেন। জীবন-মৃত্যু স্রষ্টার হাতে।...এটা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন, ডক্টর হ্যাগ। আসুন, এ-ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ করি।' ডক্টর রিচার্ডের হাত ধরে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। দরজার কাছে এসে সরু ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রানা।

খানিকটা দূরে ওর দিকে পিছন ফিরে হাত নেড়ে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছেন ডক্টর ব্রিল। বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ডক্টর রিচার্ড, তবে ভাব দেখে মনে হলো না প্রভাবিত হচ্ছেন। ডক্টর রিচার্ডের হাত ধরে হলের শেষে একটা কনফারেন্স রুমে গিয়ে ঢুকলেন ডক্টর ব্রিল। দেরি না করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলিভেটরে উঠে পড়ল রানা। এই মাত্র ডক্টর ব্রিল ওটাতে করে এসেছেন, কাজেই ওটা আসার জন্য অপেক্ষা করতে হলো না। এলিভেটরের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ

হয়ে গিলে নিল ওকে।

ল্যাবে চলে এলো রানা, ওর চোখ নিনাকে খুঁজছে। কোথাও দেখা গেল না তাকে। অফিসে ঢুকে ফোনের রিসিভার তুলে নিল ও, প্রায় প্রতি সপ্তাহে ওটা ছারপোকার খোঁজে চেক করা হয়, কাজেই নিশ্চিন্তে ডায়াল করল সিআইএ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ডগলাস র‍্যাকারসনের নাম্বারে। তিনবার রিং হওয়ার পর ওদিক থেকে ঘেউ করে উঠল কুত্তাটা।

'হ্যালো?'

'রানা।'

'বলুন। জানতে পারলেন কিছু?'

এ-পর্যন্ত কী ঘটেছে সংক্ষেপে জানিয়ে ডক্টর রিচার্ডের ডাইরিতে যাদের নাম আছে তাদের নাম জানাল রানা, ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করতে অনুরোধ করল। শেষে যোগ করল, 'আমাকে জানান এদের কারও সঙ্গে তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট লী তাও হানের কোন সম্পর্ক আছে কি না।'

পাঁচ মিনিট নীরবে কেটে গেল, তারপর র‍্যাকারসনের কর্কশ গলা শুনতে পেল রানা।

'না, তাইওয়ানিজদের সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক নেই। থাকার কথাও নয়। তাইওয়ানিজরা আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। যাদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বললেন তাদের ব্যাঙ্কের কম্পিউটার-রেকর্ড চেক করা হয়েছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করার মত। রহস্যময় সেই বাড়িতে ডক্টর রিচার্ড আর সেই আগন্তুক দেখা করেছিলেন, সেই বাড়িটা ডক্টর রিচার্ডের ভগ্নিপতির। রবার্ট হাটসনের।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। 'তিনিই কি ডক্টর রিচার্ডের জুয়ার ধার শোধ করছেন?'

'তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা দেখে তা-ই মনে হয়।'

'তার মানে ভদ্রলোক স্ত্রীকে পর্যন্ত জানাতে চান না ডক্টর রিচার্ডের বেহাল অবস্থা?'

'আমারও তা-ই ধারণা। নামি বংশের লোক ডক্টর রিচার্ড। তাঁর স্খলন লোক জানাজানি হলে গোটা পরিবারের মুখে চুনকালি পড়বে।'

অফিসের দরজায় উঁকি দিল নিনা। 'ঠিক আছে, কোনও দরকার হলে যোগাযোগ করব,' বলে ফোন রেখে দিল রানা।

'পেয়েছেন যা খুঁজছিলেন?' জিজ্ঞেস করল নিনা, এই মাত্র অফিসে ঢুকেছে, চেহারায় কৌতূহলের ছাপ।

'না। তবে ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল সময় মতো এসে ডক্টর রিচার্ডকে সরিয়ে নিয়ে না গেলে আরেকটু হলেই ধরা পড়ে যেতাম।'

নিনার চোখে অপরাধের ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। 'আমি ডক্টর অ্যাডামকে বলেছি আপনি গভর্নমেন্ট এজেন্ট। কাজটা ভাল হয়েছে, তা-ই না? নইলে উনি সময় মত ডক্টর রিচার্ডকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না।'

'ডক্টর আহমেদ যখন বাঙ্কারে খুন হলেন তখন কি ডক্টর ব্রিল অবযার্ভেশন বাঙ্কারে ছিলেন?'

রানা ডক্টর ব্রিলকে সন্দেহ করছে কি না ভেবে ভ্রূ উঁচু করল নিনা। 'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'কিছু নয়।' চেপে রাখা দম ছাড়ল রানা। চট করে কথাটা ধরেছে ও। তা হলে? স্যাবোটাজ করছে কে? 'ভাবছি ডক্টর রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলতে যাব।' নিনাকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল ও। বলল, 'আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে এখানে যা ঘটছে তার সঙ্গে ডক্টর রিচার্ড আর ব্রিলের কোন সম্পর্ক নেই। প্রথম টেস্টের সময় ডক্টর আহমেদ যখন খুন হন তখন তিনি আর ডক্টর ব্রিল সিনেটর আর মিলিটারি জেনারেলদের সঙ্গে অভযার্ভেশন বাঙ্কারে ছিলেন।'

ডক্টর রিচার্ড কোথায় তা রানা জিজ্ঞেস করার আগে নিনাই ইতস্তত করে বলল, 'ডক্টর রিচার্ড ডক্টর ব্রিলকে নিয়ে মেইন

কন্ট্রোল বাঙ্কারে চলে গেছেন। সঙ্কের টেস্টের জন্যে কম্পিউটারের ফাইনাল প্রোগ্রামিং করা হবে। কাজটা নিজে করবেন উনি।'

উঠল রানা। 'আমি যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। খুবই জরুরি ব্যাপার। টেস্ট হয়তো আবারও স্যাবোটাজ করা হবে। সেটা ঠেকাতে হলে ভিতরের খবর জানে এমন কাউকে দরকার।'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল নিনা। চেহারায় আতঙ্কের ছাপ। ভাবছে আবারও না জানি কী ক্ষতি করে বসে শত্রুপক্ষ। অফিস থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

'কী চান?' খানিকটা কড়া শোনাল ডক্টর রিচার্ডের কণ্ঠ। রিমোট টেলিটাইপ টার্মিনালের সামনে খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, লেযার ক্যাননকে নিয়ন্ত্রণ করা কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম করছেন।

'আপনার খানিকটা সময় নেব,' বলল রানা। 'খুব জরুরি।'

'আপনি যে-ই হন না কেন, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। ওয়ার্কশালার কন্ট্রোল সাড়া দিচ্ছে না। আপনাকে বলে লাভ নেই, আপনি তো এসব ব্যাপারে কিছুই জানেন না, কী বলেন?'

ঝট করে ঘুরে তাকালেন ডক্টর ব্রিল, দু'চোখে বিস্ময়।

'আপনি তা হলে জানেন আমি ডক্টর আহমেদ নই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কখন থেকে জানেন?'

'প্রায় শুরু থেকে। আপনার কিছুই ডক্টর আহমেদের সঙ্গে মিলছিল না। শুধু ছোট ছোট ব্যাপারেই নয়, জরুরি অনেক ব্যাপারেও আপনি ভুল করেছেন। ডক্টর আহমেদকে চোখে দেখায় চিনত এমন যে-কাউকে আপনি হয়তো ফাঁকি দিতে পেরেছেন, তবে আমাকে পারেননি।'

'আমার ব্যাপারে সিকিউরিটিকে জানাননি কেন?'

'আপনি কম্পাউন্ডে ঠিকই ঢুকতে পেরেছেন। তাতে আমি অত্যন্ত অবাক হই। অবশ্য পরে একটু চিন্তা করতেই বুঝলাম

আপনি সরকারী লোক। সরকারী ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাইনি।'

'জানতেন আমি মদ্যপান আর জুয়ার কারণে আপনাকে সন্দেহ করছি?'

আস্তে করে মাথা দোলালেন ডক্টর রিচার্ড।

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'প্রোগ্রামিঙে সমস্যা হচ্ছে বলছিলেন। একটু খুলে বলুন।'

'আপনি বুঝিয়ে দিন, ডক্টর ব্রিল।' হাতের ইশারা করলেন রিচার্ড হ্যান্স।

'কী বলব, আমি নিজেই তো বুঝছি না!' উস্কোখুস্কো চুলে হাত চালালেন বিজ্ঞানী। পর্যুদস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। হতাশ চেহারায় মাথা নাড়লেন। 'ট্র্যাকিং প্রোগ্রাম চেক করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, করতে পারল না।'

'আরও কোন ইনপুট আছে? ধরুন কোন ওভাররাইড প্রোগ্রাম থেকে? এমন একটা, যেটা আর সব প্রোগ্রামিং ঠেকিয়ে দিতে পারে? অন্য কোন কোঅর্ডিনেট ফলো করবে?'

উত্তেজনার ছাপ পড়ল ডক্টর রিচার্ডের চেহারায়। 'কী জানেন আপনি এ-ব্যাপারে? বলুন!'

'চেক করে দেখুন আগে।'

রিমোট টার্মিনালে নেচে বেড়াতে শুরু করল ডক্টর রিচার্ডের মোটা, মোটা আঙুল। পাঁচ মিনিট পার হওয়ার আগেই ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন! অন্য একটা প্রোগ্রাম থেকেই শুধু ডাটা নেবে ট্র্যাকার! আইআর ট্র্যাকিং ডিভাইস বাদ করে দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা কী?' স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নাম্বারগুলোর দিকে তাকালেন তিনি।

'লেযার যেখানে হিট করবে সে-জায়গাটা নিশ্চয়ই মিসাইল যেখান দিয়ে আসবে তার কাছেই, তা-ই না?' বিজ্ঞানীকে আরও অবাক করে দিল রানা। 'স্যাটেলাইটের অরবিট জানা আছে

আপনার?'

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন ডক্টর রিচার্ড, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। 'আপ...
ভাবছেন আবারও কেউ প্রজেক্ট স্যাবোটাজ করতে চেষ্টা করছে?'

'হ্যাঁ।' কাছের ফোনটা থেকে কলোরাডো স্প্রিংসের শাইয়্যা...
মাউন্টিনের নোরাড হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে রিং করল রানা...
সিআইএ-র দেওয়া বিশেষ কোড ব্যবহার করল। গ্রিন সিগন্যা...
পেতেই জিজ্ঞেস করল, 'চাইনিজ স্যাটেলাইটগুলোর অরবিট...
প্যারামিটার্স দরকার আমার। দাঁড়ান। এখন আমি যাঁকে দি...
তাঁকে বলুন। টেকনিক্যাল ব্যাপার উনি বুঝবেন।' ডক্টর রিচা...
হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিল রানা।

চুপ করে শুনছেন ডক্টর। শুনতে শুনতে চেহারায় অবিশ্বাসে...
ছাপ ফুটে উঠল। 'হ্যাঁ,' খসখসে গলায় বললেন তিনি। 'আব...
বলুন, প্লিজ। হ্যাঁ। ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে রানার দি...
তাকালেন, এখন তাঁর চোখে খেলা করছে নিখাদ আত...
'কম্পিউটারে ডাটা ইনপুটের কোন দরকার নেই। চাইনিজ...
সর্বাধুনিক মিলিটারি প্লাস সায়েন্টেফিক স্যাটেলাইটের ওপর ...
হয়ে আছে লেযার! ওটা ম্যানড। চারজন কসমোনট আছে ওটা...
আমরা যদি লেযার ছুঁড়ি তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে ...
স্যাটেলাইট!' অসহায় দেখাল তাঁকে। 'আমরা টেস্ট থামা...
পারছি না! কম্পিউটার বারবার নির্দেশ ওভাররাইড করছে!'

উদ্বিগ্ন চেহারায় ঘনঘন মাথা দোলালেন ডক্টর রিচার্ড, কপা...
জমে ওঠা ঘাম মুছলেন।

শীতল একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে, টের পেল রানা...
চাইনিজরা এমনিতেই খেপে আছে একটা স্যাটেলাইট হারিয়ে...
আমেরিকা যদি তাদের আরেকটা স্যাটেলাইট ফেলে দেয়, ...
হলে তাদের বিশ্বাস করানো যাবে না ব্যাপারটা দুর্ঘটনা। দুনি...
কেউই বিশ্বাস করবে না। পরিণতি: নিজেদের মুখ রক্ষা করতে...
যুদ্ধ ঘোষণা করবে চায়না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে দেরি হ...

না। কোন পক্ষ যদি নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার না-ও করে, কোটি কোটি লোক মরবে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধের প্রভাব। সারা দুনিয়ায় দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। চোখের সামনে যুদ্ধের ফলাফল দেখতে পেল রানা। বর্তমান উন্নত মিলিটারি হার্ডওয়্যারের কারণে শেষ পর্যন্ত জিতবে পশ্চিমা বিশ্ব, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে চায়না, ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নের মত।

তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্স লী তাই হানের মাধ্যমে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক চাল চেলেছে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। 'আমি বাঙ্কারে ঢুকে ক্যাপাসিটরের সঙ্গে লেযার ক্যাননটার সংযোগ ছিন্ন করে দিলে?'

'ওই বাঙ্কারে কিছুতেই ঢোকা যাবে না,' কাঁপা গলায় বললেন ডক্টর রিচার্ড। 'ডক্টর আহমেদের দুর্ঘটনার পর ওটাকে টোটালি সীল করে দিতে নির্দেশ দেই আমি। কমান্ডোরা কাউকে ঢুকতে দেবে না। নিজেরা শুধু টেস্টের পাঁচ মিনিট আগে সরে যাবে। হাতে সময় নেই মোটেই। যা করার সেটা প্রোগ্রামিং বদলে করতে হবে।'

'বদলানো যাচ্ছে না,' হতাশ শোনাল ডক্টর ব্রিলের গলা। 'ব্যাপারটা সিকিউরিটি চীফকে জানানো দরকার। গেছে কোথায় লোকটা! তার তো এখন এখানে থাকার কথা।

'আপনি রিপ্রোগ্রামিঙের চেষ্টা করতে থাকুন,' বলল গম্ভীর রানা। 'আমি বাঙ্কারে যাচ্ছি। চেষ্টা করব ওটা নিষ্ক্রিয় করতে।'

মেইন কন্ট্রোল বাঙ্কার থেকে বের হয়ে সামনে একটা ড্রাইভারহীন জীপ দাঁড়ানো দেখে নির্দ্বিধায় ওটায় চড়ে বসল রানা। চাবিটা ইগনিশনে নেই। ইগনিশনের তার ছিঁড়ে ওগুলো জোড়া দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দিল ও, তারপর সোজা ছুটল বিরাশি নাম্বার বাঙ্কারের দিকে। ড্রাইভ করতে করতেই মুখ আর হাতের ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল। এখন ওগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ডক্টর রিচার্ড জানেন ও আলী আহমেদ নয়। ডক্টর ব্রিল আর নিনাও জানে।

আর যার হাতে আলী আহমেদ খুন হয়েছেন, সে তো জানে প্রথম থেকেই।

ওর ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে বিরাশি নম্বর বাঙ্কারের কাছে এখন একজন কমান্ডোও নেই। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। এনএসএর এজেন্ট, প্রজেক্ট সিকিউরিটি চীফ জোনাথন হার্কারই তাদের সরে যেতে বলেছে। বিক্রি হয়ে গেছে লোকটা তাইওয়ানিজদের কাছে। সে-ই ডক্টর আলী আহমেদকে খুন করেছে। ব্যান্ডেজ পরে ও কম্পাউন্ডে ঢুকতেই বুঝে গেছে ও আলী আহমেদ নয়। জোনাথন হার্কারের জানা আছে কীভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করতে হয়। সমস্ত ক্লাসিফায়েড তথ্যই তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব। মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারল না রানা। গতরাতে ডক্টর রিচার্ডের গাড়ি চুরি করে ওকে অ্যাম্বুশে নিয়ে ফেলেছে সে। আজকে গেটে দেখা হয়েছে, অথচ ওকে জীবিত দেখেও তার মধ্যে চোখে পড়ার মত কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। ইস্পাতের মত দৃঢ় স্নায়ু না হলে এসব সম্ভব হত না। লোকটা সুঠামদেহী, ব্যায়াম করা শরীর। বয়সও তিরিশের বেশি নয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আদর্শ স্পাই হবার সব ধরনের গুণাগুণই আছে তার মধ্যে।

বাঁকগুলো ঘুরে দূরে দেখতে পেল ও কংক্রিটের বাঙ্কারটা। ওর ধারণাই সত্যি, একজন গার্ডও নেই এখন বাঙ্কারের আশেপাশে। নির্জন দাঁড়িয়ে আছে বাঙ্কার। ওটার ঢালু ছাদের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে লেযার ক্যাননের নল, পড়ন্ত সূর্যের হলদে আলোয় চকচক করছে ইস্পাত।

চাইনিজ কস্‌মোনটদের স্যাটেলাইটের দিকে তাক হয়ে আছে ওটা। হয়তো এতক্ষণে কম্পিউটার রিপ্রোগ্রামিং করতে পেরেছেন ডক্টর অ্যাডাম ব্রিল আর ডক্টর রিচার্ড, কিন্তু নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। এ-পর্যন্ত জোনাথন হার্কার যা করেছে তাতে কোন খুঁত রাখেনি। লী তাই হানের কথা মনে পড়ল ওর। 'ভেরি

আনপ্রফেশনাল অভ হিম।' কথাটা বোধহয় সত্যি নয়। প্রথম লেযার সুইচটা হয়তো ইচ্ছে করেই নেয়নি সে। সম্ভবত জানে দ্বিতীয়টার বৈশিষ্ট্য। প্রজেক্ট সিকিউরিটির চীফ হিসাবে তার জেনে যাওয়া সম্ভব।

বাঙ্কারের উত্তরে নিচু ঢালের গোড়ায় খালি একটা গাড়ি দেখতে পেল ও। জোনাথন হার্কারের গাড়ি। বাঙ্কারের পাশে জীপ থামিয়ে নামল রানা, হার্কারের গাড়িটার হুড খুলে ডিসট্রিবিউটার ক্যাপ ভেঙে ফেলল। চট করে এখন সরে পড়তে পারবে না লোকটা। জীপের ডিসট্রিবিউটার ক্যাপটাও খুলে নিয়ে পকেটে রেখে স্লাইড টেনে ওয়ালথারের চেম্বারে বুলেট ঢোকাল ও, তারপর ওটা বাগিয়ে ধরে এগোল বাঙ্কারের দিকে।

ডক্টর রিচার্ড বলেছিলেন বাঙ্কারটা তিনি সীল করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজটা কতখানি নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে সেটা বোঝা গেল সামনে থেকে দেখে। পুরু স্টিলের দরজা ভাঙতে হলে শক্তিশালী কামানের গোলা লাগবে। কজাগুলো যেরকম তাতে আসন্ন লেযার বিস্ফোরণের আগে কাটিং টর্চ দিয়ে ওগুলো গলিয়ে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারবে না ও। নিরেট কংক্রিটের দেয়ালে একটা জানালা নেই। ছাদটাও রিইনফোর্সড কংক্রিটের তৈরি। বড়সড় অবযার্ভেটরি টেলিস্কোপ যেভাবে বেরিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ছাদের একটা সরু ফাটলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে লেযার ক্যাননের নল। ওটার দু'পাশে ভারী স্টিলের পাত। ওদিক দিয়েও ঢোকা যাবে না।

'মাসুদ রানা?' ছাদের স্পীকার থেকে বিস্ফোরিত হলো ধাতব একটা কণ্ঠস্বর। 'তোমাকে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আমি। খামোকা চেষ্টা করছ, রানা। এখন আর আমাকে ঠেকাতে পারবে না। তুমি ঢোকার আগেই টেস্ট শেষ হয়ে যাবে।'

'লী তাই হান কত দিচ্ছে?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী বলেছে সে তোমাকে? তাইওয়ানে নিরাপদ আশ্রয় দেবে?

বোকামি কোরো না, হার্কার, সুইচটা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শেষ করে দেবে সে।'

'সবই জানো দেখছি,' গলা শুনে মনে হলো মৃদু হাসছে লোকটা। 'গুড, রানা। ইউ আর আপ টু ইওর রেপুটেশন। তবে ভুল বলছ তুমি। লেযার সুইচ যতক্ষণ আমার কাছে আছে ততক্ষণ আমার চুলের ডগাও স্পর্শ করবে না লী তাই হান। সবকিছু অনেক অনেক ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করেছি, রানা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ গার্ডদের সরিয়ে দিয়েছি? যা চাই সেটা আমি ঠিকই অর্জন করে নেব, কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি।' রানার ব্যগ্র দু'চোখ বাঙ্কারের ভিতরে ঢোকার পথ খুঁজছে। অনেক বেশি যত্নের সঙ্গে বানানো হয়েছে বাঙ্কারটা। জীপ দিয়ে যদি ওটার দেড়ফুট চওড়া কংক্রিটে গুঁতো মারা যায় তাতেও কাজ হবে না। বিস্ফোরিত বাঙ্কারটার ছবি চোখের সামনে দেখতে পেল ও। টনকে টন বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল ওটাতে। এটা ওটার চেয়েও অনেক মজবুত করে তৈরি।

'আমি চলে যাব ধরাছোঁয়ার বাইরে। রানা? আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে লেযার ছুঁড়ে স্যাটেলাইট ফেলে দিতে। ওটা তুমি দেখতে পাবে না। আন্দাজ করে নিতে পারো অবশ্য। এতক্ষণে সন্ধে-তারার কাছে চলে এসেছে জিনিসটা। বামপাশে।'

আকাশের দিকে চট করে তাকাল রানা। দিগন্তের দশ ডিগ্রি উপরে দেখতে পেল জ্বলজ্বলে শুক্র গ্রহ। কী করবে ভাবতে চেষ্টা করল রানা। লেযার কামানের নলের মধ্যে শরীর গলিয়ে দেবে? তাতে থামবে লেযার বিস্ফোরণ? না। ওকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ছুটে যাবে মারণরশ্মি। দু'হাজার মাইল যে-রশ্মির কাছে কিছুই নয়, সে-রশ্মি এভাবে থামানো যাবে না।

তবে ওই চারফুট ব্যাসের নলটাই বাঙ্কারের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। চোখ সরাতে পারছে না রানা কামানের মাথলের উপর

থেকে। ডক্টর রিচার্ড আর ডক্টর ব্রিল যদি প্রোগ্রাম করতে পারেন তা হলে কামানের নলটা বাঙ্কারের ভিতর ঢুকে যাবে। কিন্তু কিছুই ঘটছে না।

'আর তিন মিনিট, রানা!' ভেসে এলো ধাতব কণ্ঠ।

অ্যাটমোস্ফেরিক ডিসটর্শন এড়াতে সামান্য নড়ল লেযার ক্যাননের নল। হঠাৎ আকাশে দেখা গেল উজ্জ্বল একটা আলো। ওটার পিছনে আগুনের দীর্ঘ লেজ। ঠিক সময় মতোই গ্রিন রিভার থেকে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে, মিসাইল ছুঁড়তে নিষেধ করে দেওয়ার কথা রানার মনে ছিল না। ডক্টররাও ভাবেননি।

'লেযার ক্যানন মিসাইলটাকে ট্র্যাক করতে চেষ্টা করছে না, রানা,' খুশি-খুশি গলায় জানাল হার্কার। 'ওটা শুধু ট্র্যাক করছে স্যাটেলাইটের অরবিটাল প্যারামিটার্স। যেই সেটা ঠিকমত ট্র্যাক করতে পারবে, ফায়ার করবে লেযার ক্যানন। আর এক মিনিট, রানা। মিলিটারি ইতিহাসে আজকের দিনটার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

জীপের ছাদের উপর উঠল রানা, সেখান থেকে নিজেকে টেনে তুলল বাঙ্কারের ঢালু ছাদে। আস্তে আস্তে সরছে কামানের নল, লেযার ছোঁড়ার আগে নিখুঁত করে নিচ্ছে লক্ষ্য। ওয়ালথারটা বের করে কামানের নলের ভিতর গুলি করতে শুরু করল রানা। ভিতর থেকে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ পেল। জানে না এতে লেযার ক্যানন বিকল হবে কি না। এই শেষ চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

'রানা!' গর্জে উঠল লোকটা। 'কী করছ! ফায়ার করতে আর পনেরো সেকেন্ড আছে। দেখতে থাকো! ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

ওয়ালথারের ম্যাগাযিন খালি হয়ে যেতেই স্লাইডটা খোলা অবস্থায় রয়ে গেল। আরেকটা ম্যাগাযিন ভরল রানা, বাটনে চাপ দিয়ে স্লাইড বন্ধ করল। চেম্বারে নতুন বুলেট চলে আসতেই

আবার একটা একটা করে গুলি করতে শুরু করল। ভিতরে ঢুকে শক্তি শেষ হচ্ছে না বুলেটগুলোর, ছুটোছুটি করে লেযার ক্যাননের পাতলা গা ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুটোগুলো দিয়ে হিসহিস শব্দ তুলে সাদাটে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হচ্ছে। ক্যাপাসিটরের কড়কড় আওয়াজ শুনতে পেল রানা। হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রহণ করে লেযার ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ওগুলো, যে-কোন সময় বিদ্যুৎ ডিসচার্জ করবে ল্যাসিং চেম্বারে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাবে মারণরশ্মি। হঠাৎ কামানের গায়ের ফুটোগুলো থেকে চুইয়ে চুইয়ে রূপালি রঙের শীতল গ্যাস বেরোতে শুরু করল। ঘড়ি দেখল রানা, সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশ মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড। লেযার প্রক্ষেপণের সময় পেরিয়ে গেছে। লেযার ছোঁড়েনি কামানটা। নলের পাশ দিয়ে ফাটলের ভিতর উঁকি দিল ও, দেখল নীলচে বিদ্যুৎ শিখা নাচানাচি করছে ভিতরে।

'ফায়ার!' পিএ সিস্টেমে ভেসে এলো রাগান্বিত লোকটার কণ্ঠ। 'ফায়ার! গড্‌ড্যামিট! ফায়ার!'

লেযার টিউবের গায়ে কষে লাথি মারল রানা। পরপর কয়েকটা লাথি মারার পর মোটাসোটা নলটা ধপ করে খসে পড়ে গেল নীচে। যে ফাঁকটা তৈরি হলো সেটা দিয়ে সহজেই নামতে পারবে রানা। ফাঁকের ভিতর শরীর গলিয়ে দিল ও, দু'পাশের পাড়ে হাত রেখে আস্তে করে নেমে পড়ল বারোফুট নীচে বাঙ্কারের মেঝেতে।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জোনাথন, দু'চোখ থেকে বিষ ঝরছে। হাতের ইশারায় রানাকে কাছে ডাকল।

দৃঢ় পায়ে এগোল রানা, হার্কারের প্রথম ঘুসিটা মাথা কাত করে এড়িয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে একটা হুঙ্কার ছেড়ে দু'হাত মুঠি পাকিয়ে সামনে বাড়ল হার্কার। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুসি চালাচ্ছে রানার মুখ, পেট আর পাঁজর লক্ষ্য করে। ঠেকাচ্ছে ক্লান্ত রানা, পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পাচ্ছে না। সারারাতের

পরিশ্রমের পর শরীর যেন ভেঙে আসছে।

বাঁ হাতে মুখটাকে আড়াল করে রেখেছে হার্কার। কনুই দিয়ে বুকে আর পাঁজরের দিকে আসা ঘুসিগুলো ঠেকাচ্ছে। রানা বুঝতে পারল, বক্সিঙে ভাল ট্রেনিং নিয়েছে লোকটা। লড়াই শেষ করার আগে ওকে বডি পাঞ্চে আরও দুর্বল করে নেওয়াই লোকটার উদ্দেশ্য।

হঠাৎ ফলস সাইড স্টেপ নিয়ে মোক্ষম একটা সুযোগ বের করে নিল রানা, দড়াম করে হার্কারের বাম কাঁধের উপর পড়ল ওর ডানহাতি কারাতে কোপ। সামান্য কুঁজো হয়ে গেল লোকটা, পরক্ষণেই পাশের শেলফ থেকে মোটা একটা বই তুলে নিয়ে রানার ঘাড়ের পাশে মেরে বসল। মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে শতখানেক নক্ষত্রের নাচানাচি দেখল রানা।

চমৎকার শারীরিক ফিটনেস বজায় রেখেছে লোকটা। বাম গালে তার মুঠোর জোরাল এক গুঁতো খেল রানা, ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ও মেঝেতে। ওয়ালথারটা খালি, ওর হাতে চলে এলো স্টিলেটো। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, অল্প অল্প টলছে।

বামদিকের উঁচু একটা শেলফ থেকে ভারী রেঞ্চ তুলে নিল হার্কার বিদ্যুদ্বেগে, পরক্ষণেই নামিয়ে আনল রানার মাথার তালু লক্ষ্য করে।

পাশে সরে আঘাতটা এড়াতে চেষ্টা করল রানা, পুরোপুরি সফল হলো না। ওর ডান কাঁধে লাগল রেঞ্চের আঘাত। হাত থেকে ছুটে ঠং করে মেঝেতে পড়ল স্টিলেটো। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল রানা, মাথা ঘোরা সামলে নিতে বসে পড়ল মেঝেতে।

ওকে কোন সুযোগই দিল না ক্ষিপ্র শত্রু, লাথি মারল বুকে। রানা মেঝেতে হেঁচড়ে সরে যাওয়ায় খানিকটা পিছলে গেল লাথিটা। তবে লড়াই এখন হার্কারের একার, রানার নিষ্ক্রিয়তার

সুযোগে হাত বাড়িয়ে স্টিলেটো তুলে নিয়েছে সে। তার হাতে চিকচিক করে উঠল ধারাল স্টিলেটোর চোখা ফলা।

বামহাতের ইশারায় রানাকে ডাকল সে, 'এসো, রানা! ভয় কীসের? ছোরাটা তোমার রক্ত চায়। এসো!'

ঝাপসা দৃষ্টিতে লোকটার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারল রানা অত্যন্ত দক্ষ ছোরাবাজ। চোখ পিটপিট করে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাল রানা।

সামনে বেড়ে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে স্টিলেটো চালাল হার্কার হড়কে পিছিয়ে গেল রানা, আরও পিছাতে পিছাতে উঠে দাঁড়িয়ে কোনরকমে ভারসাম্য বজায় রাখল। চট করে তুলে নিল মেঝেতে পড়ে থাকা একটা মোটা শেকল। বাঙ্কারের এক কোণায় চলে এসেছে ও। কোণঠাসা অবস্থা। ওর ঠিক দু'চোখের মাঝখানে স্টিলেটো তাক করল এনএসএ এজেন্ট। তবে রানাও এখন সশস্ত্র।

হার্কার হাত বাড়িয়ে স্টিলেটো দিয়ে খোঁচা মারতেই ওর শেকল পেঁচিয়ে ধরল লোকটার কব্জি। গায়ের জোরে টান দিল রানা, টের পেল দ্রুত নড়তে গিয়ে ভারসাম্য হারাতে শুরু করেছে। ছুরিটা পড়ে গেল হার্কারের হাত থেকে। নিজেকে সামলে নিল রানা, শেকলটা এখনও ওর হাতে। ঘুরেই ক্যাপাসিটরের জঙ্গলের দিকে ছুটল হার্কার। হাত থেকে শিকল ফেলে স্টিলেটো তুলে পিছু নিল রানা।

ক্যাপাসিটরগুলোর মাথার উপর মোটা রডগুলোয় খেলা করছে হাই ভোল্টেজ নীল বিদ্যুৎ, ওগুলো এড়াতে না পারলে নিমেষে ঝলসে মারা যাবে ও। হার্কার জানে ওগুলো থেকে কীরকম বিপদ আসতে পারে। রানার কোন ধারণা নেই। বাঙ্কারের ভিতর উজ্জ্বল বাতি নিভে গেল। বদলে জ্বলে উঠল টিমটিমে কয়েকটা বাল্ব। ক্ষীণ হলদে আলোয় বাঙ্কারের ভিতর ভুতুড়ে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সাবধানে এগোল রানা। সামনে হয়তো ফাঁদ পেতে

অপেক্ষা করছে হার্কার।

চারপাশে ইলেকট্রিকের মৃদু কড়কড় আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ওযোনের রসুনের মতো কড়া গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ক্যাপাসিটরগুলো থেকে লিক করা ভারী মোবিলে পিচ্ছিল হয়ে আছে মেঝে। এক চক্কর মেরে বাঙ্কারের দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা, পরীক্ষা করে দেখল, এখনও ভিতর থেকে বল্টু লাগানো আছে। ক্যাপাসিটরগুলোর মাঝখান দিয়ে আবার সরতে শুরু করল ও, আচমকা আক্রমণের আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে আছে। মাঝে মাঝেই মেঝে পরখ করছে, তেলতেলে মোবিলে পায়ের ছাপ খুঁজছে।

ধাতুর সঙ্গে ধাতু ঘষা খাওয়ার কর্কশ আওয়াজে বোঝা গেল লেযার ক্যারিজের কাছে চলে গেছে লোকটা। বাঙ্কারে ঢোকার পর এই প্রথম রানার মনে পড়ল লেযার সুইচের কথা. লোকটা বল্টু খুলছে, লেযার সুইচটা সরিয়ে ফেলবে!

ক্যাপাসিটরগুলোর মাঝ থেকে বেরিয়ে লোকটাকে চমকে দেওয়ার জন্য নিঃশব্দে এগোল রানা। বল্টুগুলোর উপর ঝুঁকে আছে কালো একটা অবয়ব। ম্লান আলো ঝিলিক দেওয়ায় দেখল একটা বল্টু ইতিমধ্যেই খুলে ফেলা হয়েছে। অতর্কিতে ছায়ার মত কাছে চলে গেল রানা, এতক্ষণে টের পেল, মানবমূর্তি আসলে জোনাথন হার্কার নয়, তাড়াহুড়োয় তৈরি করা একটা ডামি। মাথার তালুতে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল রানা, জানল না পাইপ রেঞ্চ দিয়ে ওখানে আঘাত করা হয়েছে, তার আগেই জ্ঞান হারাল।

নয়

চোখ মেলল রানা। প্রথমে সব অন্ধকার, তারপর ঝাপসা একটু আলো দেখতে পেল। ঘুরছে সব। ঘোরার গতিটা কমতে শুরু করল। ব্যথা! মনে হচ্ছে মাথার ভিতর দুই চোখের পিছনে অনবরত ঠোকর মারছে দুটো কাঠঠোকরা। মাথাটা খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখতে পারলে হত। তবে আস্তে আস্তে কমছে দপদপে ব্যথাটা। দৃষ্টি স্বচ্ছ হতেই আতঙ্কের একটা স্রোত অনুভব করল রানা। সারা বাঙ্কারে নিয়ন বাতির মত উজ্জ্বল নীল বিদ্যুতের শিখা ছুটোছুটি করছে, একটা থেকে আরেকটা ধাতব জিনিসে নেচে বেড়াচ্ছে।

কাত হলো ও। এতক্ষণে টের পেল, হাত-পা বাঁধা। ভারী ওযোনের কারণে নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে ওর। হাঁচি দিল বার দুয়েক। বাঁধন পরীক্ষা করল। দক্ষ হাতের কাজ। খোলা যাবে না। খেয়াল হতেই লেযার ক্যাননের ক্যারিজের দিকে তাকাল। ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতরটা। বল্টুগুলো সব খুলে ফেলা হয়েছে। জোনাথন হার্কার তার অ্যাসাইনমেন্টে সফল। যে সুইচটা খেলনা আর ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের মাঝে পার্থক্য এনে দিত সেটা এখন আর জায়গামতো নেই।

হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটির কড়কড় আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দেওয়ার মতো। কন্ট্রোল প্যানেলের বেশিরভাগ মিটারই সর্বোচ্চ নির্দেশ করছে। কয়েকটার কাঁটা শেষ দাগটাও ছাড়িয়ে

গেছে। যে-কোন মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি ওভারলোড হয়ে যাবে। কিছু জানা না থাকলেও রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না, বাঙ্কারের ভিতর ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। নিজেকে ফাঁদে আটকে পড়া জন্তু বলে মনে হলো ওর।

স্ট্যাটিকের ভিতর দিয়ে রেডিওতে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর রানার শঙ্কা নিশ্চিত করল। লোকটা বিপজ্জনক ওভারলোড লেভেল ঘোষণা করছে 'ডেঞ্জার! ডেঞ্জার! অল পার্সোনেল ইভাকুয়েট প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেন বাঙ্কার। রিপিট। এক্সট্রিম ডেঞ্জার। ইমার্জেন্সি ওভাররাইড ননঅপারেশনাল। কল বেয সিকিউরিটি অ্যান্ড ফায়ার কন্ট্রোল টীম টু...'

মাইকের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল কাছেই একটা হেলিকপ্টারের এঞ্জিনের গর্জনে। দূরে চলে যাচ্ছে যান্ত্রিক পাখিটা।

স্ট্যাটিকের আওয়াজ রানাকে বলে দিল, প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের বাঙ্কারের ভিতর। বিদ্যুৎ তরঙ্গের নৈকট্যে ঘাড়ের পিছনের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল ওর। শিউরে উঠল সর্বশরীর।

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল ও। যে প্রবল ইলেকট্রিকাল ডিসচার্জ দেখতে পাচ্ছে সেটা ক্যাপাসিটরগুলোয় জমা হওয়া ইলেকট্রিসিটির সামান্য একটা অংশ। ক্যাপাসিটরগুলো যখন আর চার্জ ধরে রাখবে না এবং ডিসচার্জ রডগুলোও যথেষ্ট ইলেকট্রিসিটি দূর করে দিতে পারবে না, তখন সবকটা ক্যাপাসিটর বিস্ফোরিত হবে। সারা বাঙ্কার ভরে যাবে ফুটন্ত মোবিলে।

ফুটন্ত তেলে ঝলসে মৃত্যু। প্রাচীন একটা শাস্তি-প্রদান পদ্ধতি। ধীর, অত্যন্ত কষ্টকর মৃত্যু। ওকে মরতে ফেলে রেখে গেছে হারামজাদা জোনাথন পার্কার। কঠোর ভাবে নিজেকে শাসন করল রানা। এসব কী ভাবছ! দেখো! ভাল করে দেখো এখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ আছে কি না। নিশ্চয়ই একটা না একটা উপায় আছে।

কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল, ফুট পাঁচেক দূরের একটা ডেস্কের তলা থেকে বেরিয়ে আছে ওর স্টিলেটোর হাতল।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে উঠে বসল রানা। এগোনোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কাত হয়ে শুয়ে আবার চেষ্টা করল। এবার ছেঁচড়ে এগোতে পারল। হাতলের কাছে গিয়ে আবার আধ-বসা হলো। খানিক চেষ্টার পর শরীর ঘোরাতে পারল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ওর হাতের আঙুলগুলো প্রায় স্টিলেটোর হাতল ছুঁয়ে আছে। আরেকটু পিছনে হটল। ধাক্কা লেগে মোবিলের উপর দিয়ে পিছলে সরে গেল ছুরিটা।

আরও কয়েক দফা চেষ্টার পর ওটা আবার স্পর্শ করতে পারল রানা। দু'আঙুলে ধরে সাবধানে ওটাকে কাছে টানল ও। হাতলটা ধরতে পারার পর খানিক কসরৎ করতে হলো দড়িতে ওটার ফলা চালাতে। ঠিক মতো ধরতে পারছে না ছুরিটা, ফলে দড়ি কাটছে অত্যন্ত ধীরে।

বজ্রপাতের মত শব্দ করে ক্যাপাসিটরগুলো বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছে। কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। মনে হলো এক যুগ পর হাতের বাঁধন কেটে গেল ওর। স্টিলেটো খাপে পুরে দ্রুত হাতে এবার খুলে ফেলল ও গোড়ালির বাঁধন। কয়েক সেকেন্ড ম্যাসেজ করল কব্জি আর গোড়ালি। রক্ত চলাচল শুরু হতেই চিনচিনে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো।

পকেট চাপড়ে দেখল রানা, জীপের ডিসট্রিবিউটার ক্যাপ এখনও ওর কাছেই আছে। ওকে সার্চ করার ঝামেলায় যায়নি হার্কার। তার মানে এখন লোকটার গাড়ি ব্যবহারের উপায় নেই।

এবার বের হওয়ার পথ খোঁজায় মন দিল ও। যে চেরাটা দিয়ে ও ঢুকেছিল সেটার দু'পাশের স্টিলের পাত এখনও টিকে আছে। ও যখন কামানটা লাথি দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল তখন ওগুলো পড়েনি। মাথার উপরে চারপাশে যেভাবে বৈদ্যুতিক ঝড় বইছে, তাতে ও-পথে বের হওয়ার চেষ্টা যোগ আত্মহত্যার

শামিল। মসলাবিহীন কাবাব হয়ে যাবে ও চোখের নিমেষে। বারবার স্টিলের পাতগুলো ছুঁয়ে দিচ্ছে শত শত বৈদ্যুতিক ঝিলিক।

ক্যাপাসিটরগুলো পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা, কুঁজো হয়ে হাঁটছে। অবাক হলো না যখন দেখল দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার বাঙ্কারে আটকা পড়েছে ও। সেদিনের চেয়ে আজকে বিপদের ঝুঁকি বেশি বই কম নয়।

দরজাটা কতখানি মজবুত সেটা জানা থাকায় কষ্ট করে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেয়ার ঝামেলায় গেল না ও। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। কী আছে ওর কাছে যেটা কাজে লাগতে পারে? ওয়ালথারটা খালি। স্টিলের দরজায় স্টিলেটো কোন কাজে আসবে না। কয়েকটা কয়েন আছে ওর পকেটে। কয়েকটা কাগজ। একটা ডিসট্রিবিউটার ক্যাপ।

ক্যাপাসিটরগুলো থেকে বের হওয়া তাপে দোজখ হয়ে উঠছে বাঙ্কারের ভিতরটা। চামড়া জ্বলছে। ক্যাপাসিটর বিস্ফোরিত হলে ফুটন্ত মোবিলে সয়লাব হয়ে যাবে বাঙ্কার, সেই সঙ্গে ঝলসে মারা যাবে ও। মৃত্যুটা হবে ধীর, কিন্তু নিশ্চিত।

কাগজ। ওগুলো কি কাজে আসবে? ফ্রেম আর দরজার লকের মাঝখানে যদি গলিয়ে দেয়া যায়? ওভাবে সহজে তালা খোলা যায় ক্রেডিট কার্ড থাকলে। অবশ্য তালাটাও কমদামি বাজে তালা হতে হবে। ক্রেডিট কার্ড নেই ওর কাছে। বাড়িতে ফেলে এসেছে। তা ছাড়া এই তালা ওরকম সহজ কৌশলে খুলত কি না কে জানে। পকেট থেকে কাগজ বের করে ফ্রেম আর লকের মাঝখানে ঠাসল রানা। সহজেই করা গেল কাজটা।

খানিকটা সময় ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই ওর।

কাগজটা উপর-নীচ করতেই বোঝা গেল বল্টু কোথায় আছে। খানিক চেষ্টা করেই বুঝল কাগজ দিয়ে লক খোলার কোন উপায় নেই। লক খুললেও বল্টু খুলতে পারত না ও।

মনটা বলছে জরুরি কিছু একটা একদম ভুলে গেছে। মনে পড়ি-পড়ি করেও কী যেন মনে পড়ছে না। পকেট হাতড়াল রানা। কয়েন? না। তারের টুকরো? উঁহুঁ।

দরজাটা নিরেট স্টিলের তৈরি একটা অলঙ্ঘ্য বাধা। ওয়েল্ডিং টর্চ থাকলে ওটা কাটার চেষ্টা করা যেত। অক্সিঅ্যাসিটিলিন টর্চ নেই ওর কাছে। তবে...ইলেকট্রিক আর্ক টর্চ আছে। এত বড় আর্ক টর্চ আগে কখনও দেখেনি ও। ওর কয়েক ফুট পিছনে ওটা কড়মড় আওয়াজ করছে।

মোবিলে পিছল মেঝেতে সাবধানে পা বাড়াল রানা, চলে এলো একটা সাপ্লাই ক্যাবিনেটের সামনে। মনে মনে প্রার্থনা করল যা খুঁজছে তা যেন পায়। স্রষ্টা হয়তো ধারে কাছেই আছেন—শুনতে পেলেন ওর আরজি। ভিতরে পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। এক কয়েল ইলেকট্রিকের ভারী তার। কমপক্ষে ০০ গেইজ।

স্টিলের দরজার সামনে চলে এলো ও জিনিসটা নিয়ে। স্টিলেটো দিয়ে তারের এক মাথার নিওপ্রিন ইনসুলেশন চেঁছে তুলল। নগ্ন তারটা দরজার কব্জাগুলোয় পেঁচাল, তারপর আরও কয়েক পাক দিল দরজার হ্যান্ডেলে। এবার ইনসুলেশনসহ তারটা হাতে নিয়ে তাকাল ও কাছের ক্যাপাসিটরের মোটা ডিসচার্জ রডের দিকে। নীল শিখা কিলবিল করছে ওটার গায়ে, দিক হারিয়ে ছুটে যাচ্ছে চারপাশে।

ওটার কাছে যাওয়া যাবে না। প্রবল ইলেকট্রিসিটি মুহূর্তে ছাই বানিয়ে ফেলবে ওকে। অন্য কোন কৌশল করতে হবে। হাতে একদম সময় নেই। যা করার করতে হবে দ্রুত। প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে সারাশরীরের লোম দাঁড়িয়ে আছে ওর। চুলগুলো ঝাঁটার কাঠির মতো সোজা হয়ে গেছে। ক্রমেই বাড়ছে বৈদ্যুতিক ফিল্ডের শক্তি। ক্যাপাসিটরের ভিতর মোবিল ভরা ক্যানিস্টারগুলো ঠাণ্ডা হতে শুরু করা কেরোসিনের চুলোর মতো কটকট আওয়াজ করছে। আর বেশিক্ষণ নেই, বিস্ফোরিত হবে ওগুলো।

তারের অন্য প্রান্ত থেকেও ইনসুলিন চেঁছে তুলল রানা, শেষ চারফুট তার দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল, তারপর স্টিলেটো খাপে পুরে কাউবয়দের ল্যাসো ছোঁড়ার কায়দায় তারটা ছুঁড়ে দিল কাছের ক্যাপাসিটরের ডিসচার্জ রডের উপর। দু'হাতে চোখ ঢাকার সময় পেল না, তার আগেই রডের উপর গিয়ে পড়ল ভারী তারটা। সঙ্গে সঙ্গে হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল তারে। মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো ভারী কেবল। তীব্র একটা ঝিলিক রানাকে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করে দিল। ওর হাত আর বুকে ছিটে এসে লাগল গলন্ত কপারের ফোঁটা।

আতঙ্কে পিছু হটল ও। সামলে নিয়ে দেখল, যা ভেবেছিল তা-ই ঘটেছে দরজাটার। প্রচণ্ড ইলেকট্রিসিটির কারণে হাতলটা গলে স্রেফ বাষ্প হয়ে গেছে। দরজার কব্জাগুলো নেই। মেঝেতে পড়ে আছে কিছু গলে যাওয়া স্টিল। আস্তে করে খুলে বাইরের দিকে পড়ে গেল কোঁকড়ানো পাল্লা দুটো।

ছুটে বের হলো রানা, ঝেড়ে দৌড় দিল সামনের ঢাল লক্ষ্য করে। ঢাল পেরিয়ে চট করে থেমে শুয়ে পড়ল বালির আড়ালে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, তিন মিনিটের মাথায় একরাশ বালি উড়ে এসে প্রায় কবর দিয়ে ফেলল ওকে। গরম জোরাল হাওয়া বয়ে গেল চারপাশে। ছিটকে এসে পড়ল কিছু কংক্রিটের টুকরো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেল ভয়ঙ্কর গর্জন। মনে হলো একসঙ্গে কয়েকটা বাজ পড়েছে খুব কাছে। ঝরঝর করে চারপাশে পড়ছে শূন্যে উঠে যাওয়া টুকরোটাকরা। শুকনো বৃষ্টিপাত থামার পর বালি সরিয়ে ঢালের উপর থেকে উঁকি দিল রানা। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো।

অত মজবুত বাঙ্কারের কিছুই অবশিষ্ট নেই। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ফুটন্ত মোবিলে, আকাশের গা চেটে দিচ্ছে লাল-কমলা শিখা। বিশ্রী কালো ধোঁয়া আর দপদপে আগুনের ভিতর দিয়ে দেখা গেল পোড়া একটা জায়গা। ওখানেই ছিল বাঙ্কার।

কয়েকটা কালো স্তূপ দেখতে পেল, ওগুলো ক্যাপাসিটর ছিল।

প্রজেক্ট সিক্রেট ইলেভেনের সিকিউরিটি অফিসে বসে আছে রানা, ফোনে কথা বলছে, আস্তে আস্তে লালচে হয়ে যাচ্ছে ওর চেহারা। স্পীকারের কল্যাণে উপস্থিত অন্যান্যরাও ফোনালাপ শুনতে পাচ্ছে। টেবিলের ওপাশে ডক্টর রিচার্ড, ডক্টর ব্রিল আর নিনা নীরবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওর পাশে গম্ভীর চেহারায় বসে আছে সামান্থা। এই মাত্র এসে পৌঁছেছে।

'আপনি বেঁচে আছেন কি না তাতে কিছুই যায় আসে না, মিস্টার রানা!' খেঁকিয়ে উঠল ডগলাস র‍্যাকারসন। 'আপনার দায়িত্ব ছিল স্পাইটাকে ধরে প্রজেক্ট সিক্রেট-ইলেভেন সিকিওর করা। সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করার আগে তাকে তো আপনি চিনতে পারেনইনি, তারওপর হাই ভোল্টেজ লেযার সুইচটা নিয়ে সিকিউরিটি হেলিকপ্টার করে সরে গেছে লোকটা। কোথায় গেছে তা-ও জানেন না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন আপনি আপনি একটা মিযারেবল ফেইলিওর।'

'আপনাদের সিকিউরিটি চীফকে সন্দেহ করতে হবে ভেবেছেন কখনও আপনারা?' নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছে রানা। 'লোকটার অতীত রেকর্ড আপনারাই চেক করেছেন, শুধু তারপরই তাকে নিয়োগ দিয়েছেন।' রানার নিজের কাছেই মনে হলো মিথ্যে অজুহাত দিচ্ছে ও, ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে প্রসঙ্গ পাল্টাল ও, 'হেলিকপ্টারটা কোনও এয়ারপোর্টে নেমেছে?'

'না। ওসব চেক করা হয়েছে।'

'হার্কারের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে? তারা বলতে পেরেছে কিছু?'

'হ্যাঁ, যোগাযোগ করা হয়েছে। কিছুই জানে না তারা। তার ছয় বান্ধবীর ছয়জনকেই সে ছয় রকম কথা বলে গেছে। মাঝে মাঝে সে বান্ধবীদের নিয়ে লাস ভেগাসে যেত। ব্যস, এছাড়া আর

কোন তথ্যই নেই লোকটা কোথায় যেতে পারে সে-সম্বন্ধে।'

'আমি ডক্টর রিচার্ড, ডক্টর ব্রিল আর নিনার সঙ্গে কথা শেষ করে আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব,' জানাল রানা।

'আপনাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে,' কর্কশ স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল র‍্যাকারসন, বিকৃত আনন্দ অনুভব করছে খবরটা দেরিতে দিয়ে। 'প্রেসিডেন্ট নিজে জানিয়েছেন তিনি চান না আমরা আর আপনার সাহায্য গ্রহণ করি। আপনাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই, মিস্টার রানা।'

খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেল রানা, ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। আমেরিকানদের দোষ দেয়া যায় না। সত্যিই চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে ও। ওকে ময়লা আবর্জনার মত পরিত্যাগ করা হয়েছে। এই অপমানটা শুধু ওর একার নয়, বাংলাদেশেরও। মেজর জেনারেলের ভ্রূ কুঁচকানো চেহারা দেখতে পেল ও মনের চোখে। নীরবে যেন তিরস্কার করছেন।

'লোকটা একটা চামার,' মন্তব্য করলেন অ্যাডাম ব্রিল। 'কী একটা ব্যবহার করল, ছিহ্!'

সায় দিল নিনা। 'বিশেষ করে উনি বিদেশি হয়েও আমাদের জন্য এতো কিছু করার পর।'

প্রৌঢ় বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'ডক্টর রিচার্ড, আপনি অনেকদিন জোনাথন হার্কারের সঙ্গে কাজ করেছেন। বলতে পারেন সে কোথায় গিয়ে থাকতে পারে? কোনও আন্দাজ?'

'নেভাডা টেস্ট সাইটে যাবার পথে কয়েকবার আমরা লাস ভেগাসে গেছি,' বললেন ডক্টর রিচার্ড। 'তবে বলার মত কথা শুধু এটুকুই যে, কখনও জুয়া খেলেনি সে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল রানা। লোকটা জুয়া খেলে কি না তাতে কি আসলে কিছু যায় আসে? এদের কাছে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য নেই, যে-তথ্যের সূত্র ধরে ও এগোতে পারবে।

'আমি যাচ্ছি,' উঠলেন ডক্টর ব্রিল। তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে নিজের প্রথম সন্তানকে হারিয়েছেন চিরতরে।

নিনাও চেয়ার ছাড়ল। বলল, 'চলুন, ডক্টর, আমিও যাব।'

উঠলেন ডক্টর রিচার্ডও। তাঁরা সিকিউরিটি অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রানা আর সামান্থাও উঠল। কোন আলাপ হলো না বাড়ি ফেরার পথে।

'একটা কথা,' বাড়িতে ঢোকার পর বলল সামান্থা। 'হার্কার একবার আমাকে কী যেন বলেছিল, মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ছে না। তথ্যটা জরুরিও হতে পারে।'

'কোনও শহরের ব্যাপারে কিছু বলেছিল?' সোফায় বসল রানা।

'হ্যাঁ। ঠিক।' ওর উল্টোদিকে বসে কপাল টিপে ধরল সামান্থা। 'মনে করতে পারছি না। সম্ভবত একটা সিকিউরিটি কনফারেন্সে বলেছিল। স্যান ফ্রান্সিসকোতে।' চুপ করে গেল সে, অন্যমনস্ক।

'স্যান ফ্রান্সিসকোতে একটা কনফারেন্সে, তারপর, সামান্থা?'

নীরবে কেটে গেল তিনটে মিনিট, তারপর মুখ তুলল সামান্থা। 'হ্যাঁ, স্যান ফ্রান্সিসকোতে। মনে পড়েছে। স্যান ফ্রান্সিসকো প্রেমিকদের শহর বা এধরনের কিছু বলেছিল কয়েকবার আমি আর অ্যালি স্যান ফ্রান্সিসকো গেছি তার সঙ্গে।'

আরেকটা চিন্তা রানার মাথায় দোলা দিয়ে গেল। স্যান ফ্রান্সিসকো। বেশ কিছুদিন আগে রানা এজেন্সির একটা রিপোর্টে পড়েছিল, ওখানে চায়না টাউনে তাইওয়ানিজদের প্রভাব বাড়ছে। নিজেদের একটা মাফিয়া চক্র গড়ে তুলেছে তারা। চায়না টাউনের নির্দিষ্ট এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। তাইওয়ানিজদের প্রভাব ওখানে আমেরিকান মাফিয়ার চেয়ে কম নয়। লী তাই হান কি ওখানে গেছে? ওখানে হার্কারের সঙ্গে দেখা করবে? তার মানে হার্কারও ওখানে যাবে। আসলেই যাবে কি? ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা।

লোকটা লাস ভেগাসেও গিয়ে থাকতে পারে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'স্যান ফ্রান্সিসকোতে ক'বার গেছে সে তা জানো?'

'যখনই সুযোগ এসেছে, সে গেছে,' বলল সামান্থা। 'চারবারের কথা আমার মনে পড়ে। বার্কলেতে লরেন্স বার্কলে ল্যাবে যেত সিকিউরিটি সেটআপ চেক করার জন্যে, কিন্তু থাকত স্যান ফ্রান্সিসকোতে।'

'মনে করতে পারো কোন্ হোটেলে?'

'না। মনে নেই।'

সিদ্ধান্ত নিল রানা, এজেন্সির রিপোর্টই ফলো করবে ও। স্যান ফ্রান্সিসকোতে তাইওয়ানিজদের শক্ত ঘাঁটি আছে। সেখানেই হার্কারের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

দশ

'আমিও যাচ্ছি,' রানা রওনা হবার প্রস্তুতি নিতেই শান্ত গলায় বলল সামান্থা, কখন যেন ছোট একটা ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। 'ভুলে যেয়ো না, রানা, জোনাথন হার্কার অ্যালিকে খুন করেছে। ওকে নিজের হাতে শেষ করব আমি। তা ছাড়া, আমি গেলে সে স্যান ফ্রান্সিসকোতে কোথায় কোথায় গিয়েছে সেসব জায়গায় যাওয়াও তোমার পক্ষে সহজ হবে।'

সামান্থার কথাগুলো ভেবে দেখল রানা। ওকে সঙ্গে নিতে মনের সায় পেল না। একবার ওর সঙ্গে গিয়ে মারাত্মক বিপদে

পড়েছে সামান্থা, এবারও যে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। যে করে হোক লোকটার সুইচটা হাত করতে হবে ওকে। সেজন্য প্রয়োজনে মুখোমুখি হতে হবে হয়তো লী তাই হানের। মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে সেক্ষেত্রে। সে-কথাই বলল রানা। 'গতবারের চেয়ে অনেক বেশি বিপদ হতে পারে এবার। তোমার বোধহয় না যাওয়াই ভাল।'

'দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে হার্কার, আমার স্বামীকে খুন করেছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সামান্থা। 'অ্যালির আত্মার শান্তির জন্যেই লোকটাকে নিজ হাতে খুন করব আমি। আমি যাচ্ছি। হয় তোমার সঙ্গে, নয়তো একা।'

সামান্থার চোখের দিকে তাকাল রানা। জ্বলছে যেন বাদামী চোখ জোড়া। আর আপত্তি করল না রানা। একা যাবার চেয়ে সামান্থা ওর সঙ্গে গেলেই বিপদের সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া, মহিলার উপর চোখ রাখতে পারবে ও। সিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে কি না জানতে পারবে। সিআইএর আগে সুইচটা ওর হাতে আসতে হবে, যদি আদৌ ওটা পাওয়া যায়। মেজর জেনারেলের কুঁচকানো ভ্রূ জোড়া দেখতে পেল ও। সুইচটা যে করে হোক পেতে হবে। তারপর? কোনভাবেই ওটা আমেরিকা থেকে বের করা যাবে না। আমেরিকানরা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগও খুলে চেক না করে ছাড়বে না। সেক্ষেত্রে একটা কাজই করার আছে। ওটা ধ্বংস করে দেওয়া।

সরাসরি এয়ারপোর্টে এলো ওরা, ৭২৭ বিমানের টিকেট কাটল। আধঘণ্টা পর টেক অফ করল প্লেন। নো স্মোকিং সাইন নিভে যেতেই একটা সিগারেট ধরাল রানা। আরেকটা দিল সামান্থাকে। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ হোটেলে উঠতে তোমরা?'

'ইউনিয়ন স্কোয়্যারের ওদিকে, সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলে।' একটু থামল সামান্থা, তারপর বলল, 'ঘুরে বেড়াতাম চায়না টাউনে। বেশি দূরে নয় ওটা, দু'তিন ব্লক হবে।' রানার দিকে

তাকাল চোখে কৌতূহল নিয়ে। 'লী তাই হান স্যান ফ্রান্সিসকোতে থাকবে ভাবছ। কেন? কী কারণে?'

জবাব দেওয়ার আগে এক মুহূর্ত ভাবল রানা, কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'এক নম্বর কারণ, ওটা সী-পোর্ট, দরকারে সরে পড়া সুবিধেজনক। দ্বিতীয়ত, প্রচুর টুরিস্ট যায় ওখানে, ফলে কে কোন্ দেশি তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। তৃতীয়ত, স্যান ফ্রান্সিসকো বিরাট শহর। ভিড়ে মিশে যাওয়া সোজা।'

'লী তাই হান লোকটা ভয়ঙ্কর,' বলল সামান্থা। 'ওর চোখের দিকে তাকালে গা শিউরে ওঠে।'

'বিকৃত রুচির এক স্যাডিস্ট,' মন্তব্য করল রানা। 'সোলার পাওয়ার স্টেশনে সে যা করেছে সেটা তার রসিকতার হালকা নমুনা। মানুষকে নির্যাতন করে মজা পায় লোকটা। স্পাই হিসেবে সে দুনিয়ার সেরাদের একজন। আমার ধারণা সোলার পাওয়ার টেস্ট স্টেশনে ইচ্ছে করেই সে আমাদের বাঁচার সুযোগ রেখেছিল। রেকর্ড আছে, এধরনের কাজ সে আগেও করেছে। যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, জোনাথন হার্কার বুঝবে কার পাল্লায় পড়েছে।'

'হার্কারকে খুন করে লেযার সুইচটা নিয়ে নেবে সে?' ধিকিধিকি জ্বলছে সামান্থার চোখ।

'চেষ্টা অন্তত করবেই। হার্কারের সঙ্গে লী তাই হানের দেখা হবার আগেই সুইচটা হাতে পেতে চাই আমি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সামান্থা। 'হার্কার ডেনভার বা ক্যানসাস সিটিতেও সে গিয়ে থাকতে পারে।'

জবাব দিল না রানা। মনের ইঙ্গিত অনুসরণ করছে ও। কোনও বাস্তব প্রমাণ নেই যে জোনাথন হার্কার স্যান ফ্রান্সিসকোয় গেছে।

*

বিকেল। শহরের অতি ব্যস্ততা ওদের যেন ঘিরে আছে। রাস্তায়

অসংখ্য মানুষের ভিড়, বেশিরভাগই চাইনিজ। ধীরে চলছে গাড়ির দীর্ঘ সারি। হোটেল সেইন্ট ফ্রান্সিস থেকে বেরিয়ে চায়না টাউনের এক কোনায় সাইডওয়াকে এখন দাঁড়িয়ে আছে রানা আর সামান্থা। দু'জনই ভাবছে এরপর কী করবে। অনিশ্চয়তায় ভুগছে রানা। বারবার মনে হচ্ছে হার্কার হয়তো আসেনি এই শহরে।

রানা এজেন্সির এজেন্টদের ফোনে নির্দেশ দিয়েছে ও। তারা চায়না টাউনে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ওর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করবে। বলে দেওয়া আছে, সিআইএ-র কোন এজেন্টকে চায়না টাউনে দেখলেই কিডন্যাপ করে সেফ হাউসে নিয়ে যেতে হবে। ও সুইচটার একটা ব্যবস্থা করতে পারার আগে পর্যন্ত আটকে রাখতে হবে তাদের।

'লী তাই হানের বেশ কয়েকজন কন্ট্যাক্ট আছে এদিকে,' বলল রানা। 'চলো, তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাক।'

'চলো।'

ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল দু'জন। গ্র্যান্ট অ্যাভিন্যু ধরে হাঁটছে ওরা, টুরিস্টদের মত পাশের দোকানগুলোর জানালার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিট পেরিয়ে এল। চারপাশে এখন চাইনিজদের ছড়াছড়ি। এদিকের দোকানগুলোয় হাতির দাঁতের তৈরি জিনিস বেশি। এছাড়াও আছে জেড পাথরের মূর্তি, চমৎকার ওয়াটারকালার পেইন্টিং, কাঠের কারুকাজ করা বাক্স—নানান টুকিটাকি জিনিস।

একটা দোকানের সামনে থামল সামান্থা। পেটমোটা একটা মূর্তি দেখাল। 'ওটার পেটে হাত বুলিয়ে দিলে সৌভাগ্য আসবে বলা হয়।'

কথাটা শুনেও শুনল না রানা। দোকানটা এক তাইওয়ানিজ প্রাক্তন স্মাগলারের। লোকটার নাম সুকো চ্যান। বার্মা হয়ে বাংলাদেশে হেরোইন স্মাগল করত লোকটা। একটা রেইডে

মরতে মরতে বেঁচে যায়। দুটো গুলি করেছিল রানা তার বুকে। লোকটা আহত অবস্থায় বার্মার পাহাড়ী জঙ্গলে হারিয়ে যায়। রানা ধারণা করেছিল সে মারা গেছে। অনেক পরে খবর পায়, মরেনি লোকটা, আমেরিকাতে চলে গেছে, দোকান দিয়েছে স্যান ফ্রান্সিসকোতে। তলে তলে নিশ্চয়ই এখনও স্মাগলিং করে সে।

সামান্থার কনুই ধরে দোকানের ভিতর ঢুকল রানা।

'বলুন?' সামনে ঝুঁকে এলো সুকো চ্যান, বাউ করল। দেখে মনে হলো রানাকে চেনেনি।

'হো-তাই-এর দাম কত?' মূর্তিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। ওর চোখ সুকো চ্যানের উপর থেকে সরছে না।

'আপনার রুচি অত্যন্ত ভাল,' আরেকবার বাউ করে বলল সুকো চ্যান। 'বর্তমান অনিশ্চয়তার যুগে সৌভাগ্য বয়ে আনা হো-তাই সবারই দরকার।'

'পনেরো ডলার দিলে চলবে?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা। এখনও খেয়াল করেনি রানার আড়ষ্ট ভাব।

'এত কারুকার্য করা মূর্তি কি এত কম দামে পাওয়া যায়? একশো ডলারে ছেড়ে দেব।'

শুরু হলো দরাদরি। সুযোগটা নিল রানা। সামান্থা সুকো চ্যানকে ব্যস্ত করে রেখেছে, এই সুযোগে দোকানের ভিতরটা ঘুরে দেখতে শুরু করল। ওর ভঙ্গি দেখে মনে হলো পছন্দের কিছু খুঁজছে। দোকানের পিছনের অংশ পর্দা দিয়ে ঢাকা। সেটা লক্ষ করার মত কিছু নয়, কিন্তু পর্দার পিছনে আংশিক ভাবে দেখা যাচ্ছে ভারী স্টিলের দরজা। ওটার অত্যাধুনিক লক রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দামি জিনিস রাখে হয়তো ওই দরজার পিছনে। চট করে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ও, সুকো চ্যান এখনও সামান্থার সঙ্গে দরদামে ব্যস্ত। দ্রুত দরজাটা পরীক্ষা করে দেখল। ব্যাঙ্কের ভল্টের মতো দরজাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে আধুনিক অ্যালার্ম সিস্টেমও ইন্সটল করা হয়েছে। দরজা খুললে একটা

ফটোসেল অন্য কোথাও অ্যালার্ম বাজাবে। পিছনে নিশ্চয়ই অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার করিডর আছে। চায়না টাউনগুলোয় থাকে।

মূর্তিটা হাতে পাশ ফিরল সুকো চ্যান, ক্যাশ রেজিস্টারের কাছে চলে গেল। রানাও সরে এল। তেষট্টি ডলারে হাতির দাঁতের তৈরি মূর্তিটা কিনে ঠকেনি সামান্থা। দামটা শোধ করে দিল রানা। সামান্থাকে বলল, 'এটা আমার তরফ থেকে উপহার।'

আপত্তি করতে যাচ্ছিল সামান্থা, কী ভেবে করল না।

'আমার এই সামান্য দোকানের আর কিছু কি আপনার পছন্দ হয়েছে, মাদাম?' মূর্তিটা প্যাকেট করে জিজ্ঞেস করল সুকো চ্যান। রানার দিকে তাকাল। লোকটার চোখের ভাষায় পরিচিতির কোন ছাপ দেখতে পেল না রানা।

'না, আর কিছু লাগবে না,' বলল সামান্থা। বাক্সটা সুকো চ্যানের হাত থেকে নিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'অনেক ধন্যবাদ, রানা। যাওয়া যাক, চলো।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আগে কখনও এই দোকানে এসেছ বলে মনে পড়ে?'

'না। তবে এখানে কাছেই কোথাও একটা চায়ের দোকানে আমাদের নিয়ে যেত জোনাথন হার্কার। বোধহয় ওই কোণটা পেরিয়ে হাতের ডানপাশে।'

'চলো।' পা বাড়াল রানা সামান্থার পাশে। ওর চোখের সামনে এখনও ভাসছে দোকানের ভিতরের স্টিলের পুরু দরজাটা। 'চায়ের দোকানটাতে যাব আমরা।'

রানার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো?'

'রানা, ভাই, আমি সাযযাদ,' ওপাশ থেকে বলল স্যান ফ্রান্সিসকোর রানা এজেন্সির চীফ।

'বলো।'

'দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছি আমরা। সিআইএ এজেন্ট। পুলিশ ধাওয়া করেছিল। খসিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। আমরা কি এখনও স্পটে থাকব?'

'দুয়েকজনকে রাখো।'

'জী।'

কানেকশন কেটে গেল। ফোনটা পকেটে রেখে চট করে সামান্থাকে দেখল রানা। মহিলা হোটেল থেকে নিশ্চয়ই সিআইএ-তে ফোন করেছে।

বাঁক ঘুরল রানা সামান্থাকে নিয়ে। ডান পাশে সত্যিই চায়ের একটা দোকান আছে। পুরোপুরি এশিয় ভাবধারায় তৈরি : ইয়াং হো'র টী-শপ। এই জায়গা সম্বন্ধে ওকে আগেই রিপোর্ট করেছে রানা এজেন্সি। এটা তাইওয়ানিজ মাফিয়ার শক্ত একটা ঘাঁটি।

ভিতরে আবছা আলোয় বয়দের কর্মব্যস্ততা দেখে বোঝা যায় ভাল ব্যবসা করছে টী-শপ। ঘনঘন ঢুকছে বের হচ্ছে তাইওয়ানি কাস্টোমার। চারপাশে চাইনিজ ভাষার ফুলঝুরি ঝরছে। এটা যেন আরেকটা বিশ্ব, স্যান ফ্রান্সিসকোর ভিতরে ছোট একটা তাইওয়ান।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের লক্ষ করা হচ্ছে,' নিচু গলায় অস্বস্তির সঙ্গে বলল সামান্থা।

কোনার একটা টেবিলে বসল ওরা। ওরা ছাড়া দোকানের আর সবাই তাইওয়ানিজ। রানা লক্ষ করেছে, তিনজন তাইওয়ানিজ দরজার কাছ থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এক নাকবোঁচা কাস্টোমার ভিতরে ঢুকল, ম্যানেজারকে কী যেন বলছে ফিসফিস করে। বারবার তাকাচ্ছে রানা আর সামান্থার দিকে।

সামান্থার কনুইয়ে হাত রাখল রানা। 'স্বাভাবিক আচরণ করো।'

একজন ওয়েইটার এগিয়ে এল। বিশ্রী ইংরেজিতে জিজ্ঞেস

করল, 'ইউ ওয়ান্ত অর্দার?'

'দু'জনের জন্য ওলং চা,' বলল রানা।

দু'বার মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল ওয়েইটার, হাঁটার ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো নিঃশব্দে পিছলে ভেসে চলেছে।

জ্যাকেটের চেইন খুলে দিল রানা, শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারটা বের করতে সুবিধে হবে। ইয়াং হো'র দোকানের ভিতরে পরিবেশটা আপাতদৃষ্টিতে শান্ত। তবে খেয়াল করলে বোঝা যায়, টানটান উত্তেজনা লুকিয়ে আছে শান্ত পরিবেশের আড়ালে।

চা এল, পোর্সিলিনের কাপে ঢেলে দিল ওয়েটার। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে আবার চলে গেল লোকটা।

'রানা, কিছু ঘটবে,' নিচু গলায় বলল সামান্থা।

'জানি,' চায়ে চুমুক দিল রানা। 'এক কাজ করো, চা শেষ করে হোটেলে ফিরে যাও তুমি। তুমি না থাকলে পিছনের ঘরে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। সুকো চ্যান জানে তুমি এসবের সঙ্গে জড়িত নও। তোমার কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

'সুকো চ্যান? সে কে?'

'হো-তাই বিক্রি করল যে বুড়ো লোকটা। বছর পাঁচেক আগে হেরোইন স্মাগলিং করত সে।'

ভ্রূ উঁচু করল সামান্থা। 'তোমার বিপদ হতে পারে।'

'জানি। তুমি হয়তো পরে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।' মৃদু হাসল রানা। 'এখানেই কোথাও আছে হার্কার।'

ধক্ করে জ্বলে উঠল সামান্থার দু'চোখ। 'আমি কি সিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করব?'

কথাটা শুনে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। মনের মাঝে গভীর সন্দেহ জাগল, তা হলে কি মেজর জেনারেলের কথাই ঠিক? সামান্থাকে জুটিয়ে দেওয়া হয় ডক্টর আলী আহমেদের সঙ্গে? পরীক্ষা করে দেখার জন্যে বলল, 'না। হোটেলে ফিরে যাও।

ওখানে অপেক্ষা করবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সামান্থা। চোখ দেখে রানার মনে হলো না ওর কথা শুনবে সে, ঠিকই আবার সিআইএ-তে যোগাযোগ করবে। শুধু তা করেই বসে থাকবে না, হার্কার ধারেকাছে আছে শুনেছে, কাজেই সরে যাবে না সে। সামান্থার ভ্যানিটি ব্যাগ চেক করে দেখেছে ও, একটা .৩২ রিভলভার নিয়ে এসেছে মহিলা।

চা শেষ করে সিঁড়ির ধাপ টপকে ধীর পায়ে টী-শপ থেকে বেরোল সামান্থা, যেন গ্র্যান্ট অ্যাভিন্যুর ভিড়ে মিশে যাবে। সবক'টা চোখ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওর বেরিয়ে যাওয়া দেখছে। এই সুযোগে আবছা অন্ধকারে আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে কাছের পর্দাটার পিছনে চলে এল রানা, চট করে পিছনে যাওয়ার দরজা পেরিয়ে ছোট একটা আঁধার করিডরে ঢুকে পড়ল।

সুকো চ্যানের দোকানের সেই স্টিলের দরজাটার মতই একটা দরজা রানার ভিতরে যাওয়া ঠেকাল। পিছনের করিডরগুলোয় কীভাবে যাওয়া যায় ভাবল রানা। এই দরজাতেও ফটোসেল অ্যালার্ম ইন্সটল করা হয়েছে। স্টিলের দরজায় কান পাতল ও। ভিতর থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল। কী ঘটছে ওখানে সে-সম্বন্ধে রানার কোন ধারণা নেই। কিন্তু বুঝতে পারছে, যা-ই ঘটুক, ওর বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে।

পিছন থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল ও। অন্ধকারে মিশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, তারপর দ্রুত সরে গেল দরজার পাল্লার পাশে। এখন না খুঁজলে সহজে ওর অস্তিত্ব টের পাবে না কেউ।

ভিতরে ঢুকল এক কুঁজো তাইওয়ানিজ, বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলছে। ডানে-বামে না তাকিয়ে সোজা স্টিলের দরজাটার সামনে গিয়ে থামল সে। রানা দম বন্ধ করে অপেক্ষা

করছে। লোকটা দরজা খুললে সুযোগটা নেবে ও।

চাবি দিয়ে তালা খুলে ধাক্কা দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল তাইওয়ানিজ। আস্তে আস্তে আপনাআপনি আবার বন্ধ হচ্ছে দরজাটা। তীরের মত নিঃশব্দে ছুটল রানা, কার্টোনীমের উপর দিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে ঢুকে পড়ল করিডরে। থেমে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। তিন সেকেন্ড পর ক্লিক শব্দ করে পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজার লক।

দরজার এদিকটাও ওদিকের মতই। তবে এখন ভিতরের মানুষগুলোর কথাবার্তা অনেক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বামদিকের প্রথম দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল তাইওয়ানিজ লোকটা। ওয়ালথার বের করে এগোল রানা। হলের দু'পাশে একের পর এক বন্ধ দরজা। শেষের ডানদিকের দরজাটা সামান্য খোলা। সাবধানে উঁকি দিল। মুখে গরম বদ্ধ বাতাসের ছোঁয়া পেল। ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা।

কাঠের একটা চাঁছাছোলা টেবিলের এক মাথায় বসে উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে কথা বলছে জোনাথন হার্কার। কার সঙ্গে বোঝা গেল না। লোকটা উল্টোপাশে আছে নিশ্চয়ই। দরজা সামান্য আরেকটু ফাঁক করে চোখ রাখল রানা। এবার লী তাই হানকে দেখতে পেল। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, চেহারা দেখে মনে হলো হার্কারের কথায় সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

'অনেক বেশি চাইছেন,' মাথা নাড়ল লী তাই হান। 'আগে যা কথা হয়েছিল তা-ই দেব আমি। তার বেশি নয়।'

সামনে রাখা ছোট কালো বাক্সটা দেখাল হার্কার। 'আমি যা চাইছি এটা তার চেয়ে অনেক বেশি দামি, মিস্টার হান। আপনি ভাল করেই জানেন জিনিসটা কী। তাইওয়ান এই সুইচ হাতে পেলে ইচ্ছে করলে রেড চায়না দখল করে নিতে পারবে।'

'সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনার চিন্তার বিষয় নয়,' তিক্ত শোনাল হানের গলা। 'আগেই আপনার সঙ্গে রফা হয়েছে

আমার। ভাল জিনিস দিলে প্রতিবার এক মিলিয়ন ডলার পাবেন। এখন আপনি কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।'

'আগে এরকম দুর্দান্ত কোন জিনিস আমার হাতে আসেনি,' হাসিমুখে বলল হার্কার। 'এক বিলিয়নের কমে পোষায় না, মিস্টার হান।'

একটু থমকে গেল লী তাই হান, তারপর বলল, 'অসম্ভব। তবে আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা।'

'কী?' কালো বাক্সটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে হার্কার, আসলে দেখাচ্ছে লী তাই হানকে। এটা লোকটার সাহস না নির্বুদ্ধিতা, ভাবল রানা।

'তাইওয়ানে আপনাকে আমরা গোপনে নিয়ে যেতে পারি। ওখানে সম্মান এবং ক্ষমতা, দুটোই পাবেন অফুরন্ত। সারাজীবন রাজার হালে পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেতে পারবেন। নারী-বাড়ি-গাড়ি, কিছুরই অভাব হবে না। যা চান।'

মাথা নাড়ল হার্কার। 'ওসব আমার চাই না, অন্তত তাইওয়ানে নয়। এক বিলিয়ন, মিস্টার হান। তার এক পয়সা কমেও আমি সুইচটা দিতে পারছি না। টাকাগুলো নিয়ে কী করব সেটা আমি ঠিক করে ফেলেছি। স্রেফ দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে আমার নাম। নতুন নামে নতুন পরিচয়ে আমার বাছাই করা একটা দেশে নতুন ভাবে জীবন শুরু করব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল লী তাই হান, হতাশ দেখাচ্ছে তাকে। 'ঠিক আছে, মিস্তার হার্কার, আপনি যখন ছাড়বেনই না, আমি টাকার ব্যবস্থা করছি। ওই এক বিলিয়ন ডলার,- ঠিক? আপনার সুইস অ্যাকাউন্টে তো?'

'হ্যাঁ।' কালো বাক্সটা বিমোহিতের মতো দেখল হার্কার।

রানা বুঝতে পারছে, টাকার ব্যাপারে এত সহজে লী তাই হানের রাজি হয়ে যাওয়ার অর্থ। কিছু একটা ভেবে রেখেছে লোকটা। এমন কিছু, যাতে করে তাইওয়ানকে এক পয়সাও দিতে

না হয়। হার্কারের কথা আংশিক সত্যি হবে। দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে যাবে তার নাম। গায়েব হয়ে যাবে বেপরোয়া লোকটা।

যথেষ্ট শোনা হয়েছে দু'জনের কথা, এবার ওয়ালথারটা বাগিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। দু'জনের মাঝখানে তাক করে রেখেছে পিস্তলের মাযল। বিপদ দেখলে দু'জনের যে-কাউকে সময় নষ্ট না করে গুলি করতে পারবে। 'হার্কার, তোমাকে কষ্ট করে সুইচটা বয়ে বেড়াতে হবে না,' বলল রানা। 'ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'আর এক পা-ও এগোবে না,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হার্কার। 'এগোলে সুইচটা আমি নষ্ট করে ফেলব। নিশ্চয়ই জানো, ভঙ্গুর কাঁচের ভিতর সার্কিটগুলো বসানো আছে?'

'জানি। একটা আঁচড়ও জিনিসটা নষ্ট করে দিতে যথেষ্ট।' আরেক পা এগোল রানা।

'মিস্তার রানা!' সামনে বাড়ল লী তাই হান।

চট করে তার দিকে ওয়ালথার ঘোরাল রানা।

'নড়বে না, লী তাই হান!'

'মিস্তার রানা,' নরম গলায় বলল লী তাই হান, 'আমি আপনাকে আন্দারএস্তিমেত করেছিলাম।' লোকটার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা হাত-পাখা। ওটা খুলে আস্তে আস্তে বাতাস করছে সে নিজেকে।

সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করল রানা, যদিও লী তাই হানের আচরণে বিপজ্জনক কিছুর কোন আভাস নেই। একটু বাতাস পাবার জন্য হাত-পাখা খুলেছে লোকটা। হাত-পাখাটার দিকে চলে গেল ওর সমস্ত মনোযোগ। ওটায় একটা দৃশ্য আঁকা রয়েছে। এরকম চাইনিজ পাখা আগেও অনেক দেখেছে ও।

বাতির আলো ঝিলিক মারল ওটার সামনের দিক থেকে। রানার চোখের সাবধানী দৃষ্টি ঠিকই চিনল লী তাই হান। কব্জির

মোচড়ে পাখাটা সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দিল সে। মাথা নিচু করে নিল রানা। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে মারা পড়ত ও। রানার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল হাত-পাখার স্টিলের তৈরি তীক্ষ্ণ ফলা, ঘ্যাঁচ করে গাঁথল পিছনের পুরু কাঠের দেয়ালে। পুরো তিন ইঞ্চি ঢুকে তারপর থামল। লক্ষ্যভেদ করতে পারলে রানার কল্লাটা ঘাড় থেকে খসে যেত।

সোজা হয়েই লী তাই হানের দিকে ওয়ালথার তাক করল রানা, ট্রিগারে আস্তে আস্তে চেপে বসছে তর্জনী। লাথিটা এলো জোনাথন হার্কারের তরফ থেকে। রানার পিস্তল ধরা কব্জিতে লাগল। ওর হাত থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়ালথার, ঘরের আরেকদিকের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল। পিস্তলটা পড়ার আগেই রানার হাতে স্টিলেটো বেরিয়ে এসেছে। চরকির মত ঘুরে বিদ্যুদ্‌গতিতে হার্কারের পিছনে চলে এলো ও, এক হাতে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরে ছোরাটা গলায় ঠেকাল। একটু চাপ দিতেই এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে।

লী হাই হানের হাতে আরেকটা হাত-পাখা দেখল রানা। লোকটা ওর কণ্ঠনালী দেখছে। প্রথম সুযোগেই ক্ষুরধার পাখা ছুঁড়ে দেবে।

'ওটা ফেলো,' নির্দেশ দিল রানা। 'নইলে হার্কার মারা পড়বে।'

হাসি হাসি হয়ে গেল লী তাই হানের চেহারা। 'সত্যিই আপনি মনে করেন এই বিশ্বাসঘাতকের জীবনের কোন দাম আছে আমার কাছে, মিস্তার রানা? খুন করে ফেলুন।'

আপাতত হার্কারকে খুন করার কোন ইচ্ছে নেই রানার; লোকটা এত বোকা নয় যে আসল সুইচটা এখানে নিয়ে এসে লী তাই হানের মতো দক্ষ এজেন্টের সঙ্গে দরদাম করতে চেষ্টা করবে। তার মানে অন্য কোথাও সুইচটা রেখে এসেছে সে। লোকটা মারা গেলে ওর কাজ কঠিন হয়ে যাবে। হার্কারের মুখ

খোলাতে হবে পরে। তার আগে, মোকাবিলা করতে হবে লী তাই হানকে। একটু পিছনে সরল রানা, তারপর বাম হাতে গায়ের জোরে কারাতে কোপ মারল হার্কারের ঘাড়ে। থপ করে একটা ভোঁতা আওয়াজ হলো। লোকটার অচেতন দেহটা মেঝেতে পিছলে পড়তে দিল রানা, ওর হাতে স্টিলেটো তৈরি। লী তাই হানের অর্ধচন্দ্রাকার ব্লেডের তুলনায় স্টিলেটো মোটেই কম বিপজ্জনক নয়।

দু'জন দু'জনকে চোখে চোখে রেখে টেবিলটা ঘিরে ঘুরতে শুরু করল ওরা। দু'জনই সুযোগ খুঁজছে। একটু অসতর্কতা এখন নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

পিছিয়ে টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল লী তাই হান। দ্রুত সামনে বাড়ল রানা, খোঁচা মারল লোকটার কব্জি লক্ষ্য করে। হাত-পাখার ব্লেড ঘুরিয়ে নিখুঁত ভাবে স্টিলেটোর চোখা মাথা ঠেকিয়ে দিল লী তাই হান। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠল। বাহুতে জোরাল ঝাঁকি অনুভব করল রানা। একটু পিছিয়ে এল ও। টেবিলটাকে মাঝখানে রেখে আবার ঘুরতে শুরু করেছে দু'জন। প্রতিপক্ষের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে টেবিল থেকে কালো বাক্সটা তুলে নিতে হাত বাড়াল রানা, পরক্ষণেই চট করে হাত ফিরিয়ে নিল। আরেকটু হলেই হাত-পাখার ব্লেডে কব্জি কাটা পড়ত ওর। কাঠের ভিতর পুরো এক ইঞ্চি ঢুকে গেছে ব্লেডগুলো। লাথি দিয়ে টেবিলটা লী তাই হানের দিকে ঠেলল রানা। লোকটার হাত থেকে পাখাটা খসে গেল, কিন্তু লাফিয়ে টেবিলটা এড়াল হান। কালো বাক্সটা হাতের মুঠোয় পুরে ফেলল রানা।

'এক মিনিট, মিস্তার রানা,' আরেকটা হাত-পাখা বের করে ফেলেছে লী তাই হান। 'এক মিনিট। আসুন, একটা রফায় আসি।'

ভ্রু নাচাল রানা। 'কী ব্যাপারে?'

'সুইচিং ডিভাইসটা দিয়ে দেবেন, বদলে ফেরত পাবেন সামান্থা আহমেদকে।'

'কাকে?' গলা থেকে বিস্ময় লুকাতে পারল না রানা।

'ডী-শপ থেকে বের হতেই তাকে বন্দি করেছি আমরা। ইয়াং হো কিডন্যাপার হিসেবে খুবই দক্ষ। মহিলার কোন ক্ষতি করা হয়নি। কিন্তু এখন, মিস্তার রানা, আপনি যদি সুইচটা না দেন তা হলে মহিলা জানবে তাইওয়ানিজ ইন্টারোগেতিভ এজেন্সি বন্দিদের মুখ খোলাতে কী করে। শুরু হিসেবে একটা একটা করে নখ উপড়ানো হবে আগে প্লায়ার্স দিয়ে।'

লোকটার কথা শোনার দিকে মনোযোগ দেওয়া মোটেই ঠিক হয়নি, একটু দেরিতে বুঝল রানা। লী তাই হানের ঠোঁটে রহস্যময় হাসিটা ওকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলল। পিছনে স্লিপার পরা পায়ের মৃদু খসখস আওয়াজ শুনতে পেল রানা। চুলে হাওয়ার স্পর্শ পেল। তারপর তালুতে নেমে এল একটা পাইপ। ধপ করে মেঝেতে পড়ল রানা, হাত থেকে স্টিলেটো আর সুইচিং ডিভাইস, দুটোই ছুটে গেছে।

একটু পরই চেতনা ফিরল ওর। মাথাটা টিসটিস করছে ব্যথায়। একটা চেয়ারে বসিয়ে বাঁধা হয়েছে ওকে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করল রানা। সহজই হবে কাজটা, কব্জির বাঁধন পরীক্ষা করে বুঝতে পারল।

'মিস্তার রানা, সংজ্ঞা ফিরেছে তা হলে,' টিটকারির সুরে বলল লী তাই হান। 'দড়ি খুলতে চেষ্টা করার দরকার নেই। দড়িটা হিসেব করেই বাঁধা হয়েছে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই কয়েক মিনিট লেগে থাকলেই আপনি মুক্ত হয়ে যেতে পারবেন।'

ওর সামনে এসে দাঁড়াল লী তাই হান। পিছনে দেড়ফুটি তার থেকে ঝুলন্ত উজ্জ্বল নগ্ন বালবের কারণে লোকটার চেহারা অস্পষ্ট দেখল রানা। 'সত্যি আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হলো,' বলল

তাইওয়ানিজ। 'এখন আমি জানি দুনিয়ার সেরাদের হারাতেও কোন অসুবিধে হবে না আমার। আগেও জানতাম, কিন্তু হাতে এরকম প্রমাণ ছিল না। এখন আপনি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এই আত্মবিশ্বাসটা আমার কাজে আসবে। আপনি প্রতিপক্ষ হিসেবে যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন, মিস্তার রানা।' কর্কশ খকখক আওয়াজ করে হাসল লোকটা। সরু দুটো চোখে নির্ভেজাল আনন্দ। 'কী হলো, মিস্তার রানা? এত সহজেই পরাজয় মেনে নিলেন? হাল ছাড়বেন না, মিস্তার রানা। এহ, মিস্তার রানা, আপনাকে চিরবিদায় জানাতে হচ্ছে। এবার কিন্তু আগের মত ঠাট্টা নয়, কেমন?'

'মাথায় একটা বুলেট, না কি তোমার ওই ব্লেড দিয়ে গলা কেটে দেবে?' কব্জির বাঁধন খুলতে ব্যস্ত রানা। ওর প্রয়াসই দেখছে লী তাই হান, মুখে মুচকি হাসি। কাজটায় ক্ষান্ত দিল ও।

আস্তে আস্তে হাত-পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে লী তাই হান। 'আপনি সেরাদের সেরা, মিস্তার রানা। আপনাকে তো আর আমি সাধারণ ভাবে বিদায় জানাতে পারি না। আপনার জন্যে অনেক ভেবে ব্যবস্থা নিয়েছি। আমি চলে যাবার পর দরজাটা বাইরে থেকে লক করে দেয়া হবে, মিস্তার রানা। দেয়ালের কয়েকটা গর্ত খুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি, খোলা হবে ওগুলো। ইয়াং হোর ইঁদুরগুলো সাতদিন ধরে খাবার পায়নি। আমি বেরিয়ে যাবার পর ওগুলো গর্ত দিয়ে এ-ঘরে আসার সুযোগ পাবে। মিস্তার রানা, ভুলে যাবেন না, সাতদিনের উপোস করা শ'দুয়েক ইঁদুর আসছে আপনার জন্যে। সময়টা আপনার সুন্দর কাটুক।'

ছোট্ট একটা বাউ করে বেরিয়ে গেল লী তাই হান, পিছনে বন্ধ হয়ে গেল তিন ইঞ্চি পুরু স্টিলের দরজা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, জোনাথন হার্কার ঘরে নেই। এটা বোধহয় অন্য ঘর। তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

লী তাই হানের জানার কথা আসল সুইচটা হার্কার সঙ্গে করে আনেনি। সুইচের বিনিময়ে সামান্থাকে ফেরত দেবার কথা বলে আবার মস্করা করছিল লোকটা।

মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। কয়েকবার গায়ের জোরে টানাটানি করতেই কব্জির বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল। দ্রুত হাতে গোড়ালির বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াল, কব্জির রক্ত প্যান্টে মুছে তাকাল চারপাশে।

হ্যাঁ, আরেকটা ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। ছোট একটা সেলার এটা। দেয়ালগুলো নিরেট পাথরের তৈরি। দরজায় কাঁধের ধাক্কা দিয়ে বুঝল, ওটা খোলা বা ভেঙে বেরোনো অসম্ভব। বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হয়েছে। এপাশে কোন তালা নেই। লক পিক থাকলেও দরজা খুলতে পারত না ও।

মেঝের কাছে পাথরের দেয়ালের গোল গোল ফুটো দিয়ে বাদামী রঙা ক্ষুধার্ত ধেড়ে ইঁদুর ঢুকতে শুরু করল, তাজা খাবারের গন্ধে কিচকিচ শব্দ করতে শুরু করেছে।

এগারো

লাফ দিয়ে চেয়ারে উঠল রানা। অজান্তেই ঢোক গিলল। ইচ্ছে করেই বাতিটা জ্বেলে রেখে গেছে লী তাই হান, ফলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও কপালে কী আছে। বাতি না থাকলে হয়তো ব্যাপারটা কম আতঙ্কজনক হতো। উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে ইঁদুরগুলোর চোখা চোখা দাঁত। ওর ঘ্রাণ পেয়েছে ওগুলো।

উত্তেজিত হয়ে উঠছে। শত্রুর দুর্বলতা আঁচ করতে পারছে, ফলে এগোচ্ছে নির্ভয়ে। দুটো ধেড়ে চেয়ারের পায়া বেয়ে উঠতে শুরু করল।

দুটোর একটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল রানা, অন্যটা উঠে পড়েছে চেয়ারের বসার জায়গায়। ওটার উপর শরীরের ভর চাপাল ও। পায়ের নীচে কিঁচকিঁচ করে উঠল ইঁদুরটা। অন্যটা ধপ করে মেঝেতে পড়ে আবার এগিয়ে আসছে। জুতোর ধাক্কায় পায়ের তলার ইঁদুরটা মেঝেতে ফেলল রানা। ওটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার উপর। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর সাদা সাদা কয়েকটা সরু হাড় ছাড়া আর কিছুই রইল না ইঁদুরটার। রানা টের পেল, গলার ভিতরটা চৈত্রের রোদে পোড়া মাটির মত শুকিয়ে গেছে ওর।

ছাদটা চট করে দেখল। মোটা মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ওখান থেকে তক্তা খসাতে হলে ক্রোবার লাগবে। ওর কাছে কিছুই নেই। স্টিলেটোও না। একটা সরু তার থেকে ঝুলছে জ্বলন্ত বাতিটা। ওটা কোনও কাজে আসবে? ঝড়ের গতিতে চিন্তা করছে রানা। ইতিমধ্যেই কয়েকটা ইঁদুর ওর পায়ের মাংসে দাঁত বসিয়েছে। পা ঝাড়া দিয়ে ওগুলোকে ছিটকে ফেলে দিল ও। রক্ত ঝরছে পা থেকে। গন্ধটা পেয়ে আরও লোভী হয়ে উঠেছে ইঁদুরগুলো।

দু'হাতে কাঠের বীম ধরে ঝুলে পড়ল রানা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল, এভাবে বেশিক্ষণ ঝুলতে পারবে না ও। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলে থাকতে গিয়ে হাত দুটো টনটন করতে শুরু করেছে। নীচে নামতেই হবে ওকে। চেয়ারের দিকে তাকাল। ওটার বসার জায়গায় ঠেলাঠেলি করে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখছে পনেরো-বিশটা ক্ষুধার্ত ইঁদুর।

মেঝেতে নামা আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই ব্যাপার। ঘরের মেঝে দেখা যাচ্ছে না বাদামী রোমশ প্রাণীগুলোর কারণে।

আরও ইঁদুর ঢুকছে পাথুরে দেয়ালের গর্তগুলো দিয়ে। শার্ট-প্যান্ট গুঁজে গর্ত বন্ধ করতে পারলেও হয়তো বাঁচার সামান্য সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন এসব ভেবে আর কোন লাভ নেই। অন্তত শ'দুয়েক ইঁদুর ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতর, আরও ঢুকছে। এতগুলোর বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই ওর।

চেয়ারের উপর থেকে লাফিয়ে উঠে ওর কাফ মাসল্ কামড়ে ধরল একটা ধেড়ে। আঁচড় কেটে ক্রমেই উপরে উঠে আসছে। উরুতে দাঁত বসিয়ে দিল। এক হাতের ঝাপটায় ওটাকে ছিটকে ফেলে দিল রানা। আরও কয়েকটা ইঁদুর লাফ দিল। ব্যথায় আগেই শরীর গুটিয়ে নিয়েছে ও। ওকে ধরতে না পেরে ধপধপ করে মেঝেতে পড়ল ওগুলো। ভয় কাটিয়ে উঠেই আবার পথ করে এগিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করল। ওর নীচের চেয়ারটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে রোমশ জানোয়ারগুলো।

দ্রুত বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, নইলে ইঁদুরের খাবার হয়ে যাবে ও। এক হাতে বীম আঁকড়ে ধরে আরেক হাত বাড়াল রানা ইলেকট্রিকের তারটা ধরতে। নগ্ন বালবটা কাছে এনে সাবধানে ভাঙল। খেয়াল রাখল যাতে ভিতরের টাঙস্টেন কয়েলটা ঠিক থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের কারণে ফিলামেন্টটা অক্সিডাইয হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আরও কয়েক সেকেন্ড জ্বলজ্বল করে জ্বলবে ওটা।

যথেষ্ট সময়। শুকনো খটখটে কাঠে আগুন লাগাতে এর চেয়ে বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। ছোট কয়েকটা ফুল্কি অনিশ্চিত ভাবে কাঠের গা চাটতে শুরু করল, নিভে যাবে না কি জ্বলবে ঠিক নেই। তারপর আগুনটা ভাল মত ধরল। পটপট আওয়াজ করে পুড়তে শুরু করল তক্তাগুলো। দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। তাপ লাগছে রানার মুখে। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘরের ভিতরটা।

নীচ থেকে ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজ আসছে। নির্দ্বিধায় রানা সিদ্ধান্ত নিল, আগুনে পুড়ে মরা জীবন্ত অবস্থায় ইঁদুরের খাদ্য

হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। ধোঁয়ার কারণে কম সাহসী ইঁদুরগুলো তাদের পাথুরে গুহা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আগুনটা আরও ভাল ভাবে ধরেছে। ইলেকট্রিকের শর্টসার্কিট হওয়া অবশিষ্টাংশের স্পার্ক দিয়ে ওটাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে রানা।

একটা ফিউজ বন্ধ হয়ে যেতেই ক্ষণিকের জন্য ঘরের ভিতরে অন্ধকার নামল। আর পারছে না রানা। হাত দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। এবার নামতেই হবে। হাত ছেড়ে মেঝেতে নেমে পড়ল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সাহসী ইঁদুরগুলো আক্রমণ করে বসল। তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে ওর গোড়ালি আর কাফ মাসলে, হাতে বুকে। পা বেয়ে উঠতে শুরু করল আরও কয়েকটা। ওগুলো উরুতে কামড় দিতে চায়। হাতের ঝাপটায় ইঁদুরগুলোকে ঝেড়ে ফেলছে রানা, শ্বাসের ফাঁকে অজান্তেই বিড়বিড় করছে, 'ধর! আগুন ধর্!'

কাঠের বীমে আগুন লেগে গেছে। পুড়ছে শুকনো কাঠ। ঘরের ভিতরটা লালচে আভায় ভরে উঠল। তক্তাগুলোয় অপেক্ষাকৃত কম গতিতে আগুন ধরছে, তবে ধরছে ঠিকই। ঘরটা পোড়া-কাঠের ধোঁয়ায় ভরে গেছে। শ্বাস নিতে পারছে না রানা। হামাগুড়ি দিয়ে বসতে হলো ওকে। নীচের দিকে ধোঁয়া কম। মাত্র দু'একটা সাহসী ইঁদুর এখনও রয়ে গেছে ঘরে। তারপর ওগুলোও থাকল না। হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেল গুহার ভিতর, নিজেদের আস্তানায়।

আগুনের কারণে ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, বুঝল রানা। কিন্তু আগুনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে কী করে ও? ভাল মত ধরে যাওয়া আগুনের তাপে চামড়া জ্বলতে শুরু করেছে। ভ্রূ আর চুল পুড়ে যাচ্ছে। ধোঁয়ার মেঘে বন্ধ হয়ে আসছে শ্বাস।

হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের এক কোনায় সরে গেল রানা। পিঠ পুড়ছে তাপে। ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া আর কোন

লাভই হয়নি ওর। ঘামে ভেজা শার্ট থেকে বাষ্প উঠতে শুরু করল। এক হাতে চোখ ঢেকে রাখল রানা। ঘরের মাঝখানের বিম পুড়ে ঝরঝর করে খসে পড়ল। একটা লম্বাকৃতি ফাঁক তৈরি হলো। গরম বাতাসের ঝাপটা খেল রানা। মনে হলো, ঠিক যেন জ্বলন্ত ফার্নেসের ভিতর আটকা পড়েছে। নতুন তৈরি হওয়া গর্তটা দিয়ে ধোঁয়া আর তাপ বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। অক্সিজেন পেয়ে এবার আরও দ্রুত ছড়াতে শুরু করল আগুন।

এটাই ওর সুযোগ। ঝরে পড়া ফুল্কির মধ্যে দিয়ে এগোল রানা, জ্বলন্ত চেয়ারটা গর্তের তলায় সরিয়ে এনে তার উপর উঠে দাঁড়াল, তারপর দু'হাতে পোড়া গর্তটার দু'পাড় ধরে নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল। হাত দুটো পুড়ছে ওর। সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা পড়ে গেল। থামল না রানা, দাঁতে দাঁত চেপে জ্বলুনি আর ব্যথা সহ্য করে শরীরটা তুলছে গর্ত দিয়ে। উপরে উঠে পাশের ঘরে চলে এল। এ-ঘরটাও ধোঁয়ায় ভরে গেছে, তবে আগুন এখনও পৌঁছোয়নি এখানে।

সামনে দরজা পেয়ে ওটা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। চারপাশে তাকাল। এটা ইয়াং হোর টী-শপ। চার দেয়াল এখন গনগনে কয়লা। একজন কাস্টোমারও নেই। আগুন! আগুন! চিৎকার শুনে আগেই ভেগেছে সব।

দূর থেকে ফায়ার ব্রিগেডের সাইরেনের আওয়াজ আসছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। শার্টে আগুন ধরে গেছে। ছুটতে শুরু করল এবার। দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেরিয়ে এল ইয়াং হোর দোকান থেকে, তারপর রাস্তার এক ধারে ডাস্টবিন দেখতে পেয়ে শুয়ে পড়ল ভেজা ভেজা ময়লার ভিতর। কয়েকবার গড়াগড়ি দেওয়ার পর আগুনটা নিভল। উঠে বসে দেখল, কয়েকজন চাইনিজ ভাবলেশহীন চেহারায় ওকে দেখছে। উঠে দাঁড়িয়ে সরু গলি ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা, টের পেল পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

বাইরে রাত নেমেছে। কুয়াশায় আকাশের তারাগুলো সব ঢাকা পড়েছে। শীতের শুকনো বাতাস বইছে। আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরো বাড়িটায়।

গলির মুখে থেমেছে ফায়ার এঞ্জিন। ওদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলল রানা। চায়না টাউনের এদিকটায় গা ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রাচীন বাড়িগুলো সব শুকনো পুরোনো কাঠের তৈরি। ফায়ার ব্রিগেড কর্মীরা সময়মত আগুনটা বশ করতে না পারলে গোটা এলাকার সবগুলো বাড়ি পুড়ে যাবে।

জ্বলুনি আর ব্যথায় বিবশ লাগছে রানার। টলতে টলতে সরে যাচ্ছে ও, কিন্তু কেউ ওর দিকে বিশেষ খেয়াল দিচ্ছে না। সবার মনোযোগ আর কৌতূহল কেড়ে নিয়েছে আগুন আর ফায়ার ব্রিগেড। কর্মীরা দীর্ঘ হোস খুলে জ্বলন্ত দোতলা বাড়িটার দিকে পানি ছুঁড়তে শুরু করল।

হাতের দিকে তাকাল রানা। পুড়ে কালো হয়ে গেছে প্রাথমিক শকটা কাটলেই টের পাবে জ্বলুনি কাকে বলে। পিঠে ফোস্কা পড়ে গেছে। জ্র আর চুল স্পর্শ করে বিস্মিত হলো। সামান্য পুড়ে গেলেও ওগুলো এখনও আছে! রাস্তার ধার থেকে মুঠো মুঠো কাদা তুলল ও, লেপে দিল ইঁদুরের কামড়ে তৈরি হওয়া ক্ষত আর আগুনে পোড়া জায়গাগুলোয়। বাতাস না লাগলে জ্বলবে কম। লী তাই হানের কথা মাথা থেকে দূর করতে পারছে না। দাঁতে দাঁত চেপে শপথ করল, হারামজাদাকে এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। হাত মুঠো করতেই তালুর শুকনো পোড়া চামড়া চিড়চিড় করে ছিঁড়ে গেল।

তবে শক্তি আস্তে আস্তে ফিরছে। এখন আর থরথর করে হাঁটু কাঁপছে না ওর। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, আগুন আরও ভাল ভাবে ধরেছে। দাউদাউ করে জ্বলছে ইয়াং হোর টী-শপ। লোকজনের ভিড় তাপের কারণে পিছিয়ে এসেছে। একজনের উপর চোখ আটকে গেল ওর। সুকো চ্যান। লোকটা ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে

কালো একটা লিমুযিনের দিকে চলেছে। পিছনের সিটে উঠে বসল। ওটার জানালাগুলোয় পর্দা ঝুলছে। ভিতরে আর কেউ আছে কি না বোঝার উপায় নেই।

কী করা উচিত সেটা স্পষ্ট করে ভাবার আগেই রানার শরীরটা প্রতিক্রিয়া দেখাল। রাস্তা আড়াআড়ি পার হয়ে লিমুযিনের দিকে ছুটল ও, ড্রাইভার এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে এগোতে শুরু করেছে, লিমুযিনের পিছনের বাম্পার আঁকড়ে ধরল রানা দু'হাতে। ঝটকা খেয়ে মনে হলো ওর হাত দুটো কাঁধ থেকে ছিটকে খুলে আসবে। দৌড়ে কয়েক পা এগোল ও লিমুযিনের সঙ্গে, তারপর এক হাঁটু তুলে দিতে পারল চওড়া বাম্পারের উপর। যত কঠিন হবে ভেবেছিল ততটা কঠিন হলো না লিমুযিনের পিছনে টিকে থাকা। ব্যাক ডালার খাঁজ ওকে যথেষ্ট শক্ত ভাবে ঝুলে থাকতে সাহায্য করল।

কুয়াশা মোড়া রাত চিরে এগিয়ে চলেছে লিমুযিন। পাঁচ ফুট দূরেও দৃষ্টি চলে না। কেউ ওকে গাড়িটার পিছনে ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেবে না। স্যান ফ্রান্সিসকোর শীতল কুয়াশার স্পর্শ সারা শরীরে অনুভব করছে রানা। হাড়ে দাঁত বসাচ্ছে ঠাণ্ডা। তবে পোড়া ক্ষতগুলো এখন আর ততটা জ্বলছে না।

কলম্বাস এভিন্যু ধরে যাচ্ছে গাড়িটা। কুয়াশা সরে যেতে এক ঝলকের জন্য ডানদিকে কয়েকটা টাওয়ার দেখতে পেল রানা। ফিলবার্ট স্ট্রিট ধরে দ্রুত উপরে উঠছে গাড়ি। আরেকটু হলেই খসে পড়ত রানা। দু'হাতে খাঁজ চেপে ধরে পড়ে যাওয়া ঠেকাল। কুয়াশা এদিকে পাতলা। দীর্ঘ টিলাসারি দেখতে পেল ও। মনে মনে প্রার্থনা করল, সুকো চ্যান যাতে শুধুই বেড়াতে বের হয়ে না থাকে। লোকটা কি লী তাই হানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে? যদি না যায় তা হলে ওর অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি ব্যর্থ। আবার নতুন করে লী তাই হানকে খুঁজতে শুরু করতে হবে। গাড়িটা বাঁক নিয়ে ভ্যানেস হয়ে লম্বার্ড স্ট্রিটে পড়ল, পশ্চিমে প্রেসিডিওর দিকে

চলেছে এবার।

লী তাই হান কোথায় সুকো চ্যানের সঙ্গে দেখা করবে ভাবতে চেষ্টা করল রানা। সম্ভবত সাগরের কাছে কোথাও। উপকূলে অপেক্ষা করা ফ্রেইটারগুলোর কোনটায় সবার অজান্তে উঠে পড়া লী তাই হানের পক্ষে সহজ হবে। ল্যাম্বার্ড পেরিয়ে লিংকন বুলেভার্ডে চলে এসেছে লিমুযিন। এখন রানা নিশ্চিত, সাগরের দিকে চলেছে ওরা। ওদিকের পরিত্যক্ত গান এমপ্লেসমেন্ট এখনও দু'একজন টুরিস্টকে মাঝেমধ্যে আকর্ষণ করে।

প্যালেস অভ দ্য লিজিওন অভ অনার পার হলো লিমুযিন, পিছনের একটা রাস্তা ধরে এগোল। ফানস্টনে থামবে হয়তো। এবড়োখেবড়ো রাস্তার কারণে ঝাঁকি খাচ্ছে লিমুযিন। বারকয়েক পড়তে পড়তে দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিল রানা। জেদ চেপে গেছে ওর। এর শেষ দেখতে হবে।

সেই প্রথম থেকেই দাবার বোড়ের মত খেলানো হচ্ছে ওকে। প্রায় কোন ব্রিফিং ছাড়াই অ্যাসাইনমেন্টটা পেয়েছিল ও, তারপর থেকে জোনাথন হার্কার আর লী তাই হানের হিসাব করা চালের কারণে ওর সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে ডক্টর রিচার্ডের উপর। যখন আসল ব্যাপারটা জানল, খুন হতে হতে বেঁচে গেল সোলার পাওয়ার টেস্ট স্টেশনে। তার আগে এবং পরে একের পর এক আক্রমণ করা হয়েছে ওকে।

চোখের সামনে ওকে বোকা বানিয়ে লেযার সুইচটা নিয়ে সরে পড়ল জোনাথন হার্কার। তারপর ওকে ইঁদুরের খাবার হতে ফেলে এল লী তাই হান। সামান্থাকে কিডন্যাপ করেছে লোকটা। মহিলাকে কি মেরে ফেলেছে? এপর্যন্ত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পায়নি ও এই অ্যাসাইনমেন্টে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আহা রে, বেচারা রানা!'

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল লিমুযিন, গতি কমতে শুরু করল। থেমে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে নামল রানা, রাস্তার এক ধারে অন্ধকার

ছায়ায় সরে এল। কাছেই কোথাও লী তাই হানের সঙ্গে দেখা করবে সুকো চ্যান। পায়ে হেঁটে এগোলেই সুবিধে পাবে ও। এখন একটা অস্ত্র দরকার। হয়তো সেটার ব্যবস্থাও করে ফেলতে পারবে।

এঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল। সুকো চ্যান নামল গাড়ি থেকে। লোকটা অন্ধকার একটা স্কয়্যারের দিকে পা বাড়াল। জায়গাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উপকূলীয় প্রতিরক্ষাসূচক টানেলগুলোর প্রবেশ পথ। অন্ধকারে হারিয়ে গেল সুকো চ্যান। চারপাশে একটা বাতিও নেই।

ড্রাইভার লোকটা লিমুযিনের সামনের ফেন্ডারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সাবধানে এগোল রানা। এদিকে কোন খেয়াল নেই লোকটার, পকেট থেকে একটা পাউচ আর পাইপ বের করে কী যেন করতে ব্যস্ত। পাউচ থেকে কালো একটা সিলিন্ডার বের হলো। পাইপের বোউলে কী যেন ভরল সিলিন্ডার থেকে। আগুন ধরিয়ে বুক ভরে তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া টানল। যতক্ষণ পারে ফুসফুসে ধোঁয়া আটকে রাখছে। গাঁজার কড়া গন্ধ পেল রানা। মনে হলো শারীরিক এই অবস্থাতেও গাঁজাখোর ড্রাইভারকে সামলাতে অসুবিধে হবে না। নিঃশব্দে পিছন থেকে এগোল ও।

গলায় হাত পড়ার আগে কিছুই টের পেল না লোকটা। এক হাতে ড্রাইভারের গলা পেঁচিয়ে ধরল রানা, আরেক হাতের থাবড়ায় লোকটার মুখের ভিতর চালান হয়ে গেল গাঁজাভরা পাইপ। দ্বিতীয় থাবড়ায় সমান হয়ে গেল লোকটার বোঁচা নাক। ঠিক দশ সেকেন্ড রানার হাতের ভিতর মোচড়ামুচড়ি করল সে, তারপর জ্ঞান হারাল।

লোকটাকে সার্চ করতেই তার পকেটে পাওয়া গেল ওর ওয়ালথার। গোড়ালির কাছে স্টিলেটোর খাপ বেঁধে রেখেছে। ওদুটো সংগ্রহ করে নিল রানা। এই লোকটাই বোধহয় ইয়াং হোর ওখানে পিছন থেকে ওর মাথায় বাড়ি মেরেছিল। পকেট থেকে

রুমাল বের করে লোকটার মুখে গুঁজল রানা, বেল্ট দিয়ে আচ্ছা মত হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল, তারপর গাড়ির সামনের সিটে তুলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওয়ালথার আর স্টিলেটোর পরিচিত ওজন ওর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করল। সুকো চ্যান যেদিকে গেছে সেদিকে পা বাড়াল রানা।

কংক্রিটের টানেলের প্রায় ধসে পড়া মুখটা দেখলে বোঝা যায় এখন জায়গাটা পরিত্যক্ত। কে ভাবতে পারবে একটা পরিত্যক্ত আর্মি বেজের ভিতর থাকতে পারে বিদেশি ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের ঘাঁটি?

টানেলে ঢুকে পড়ল রানা, সাবধানে এগোল। বদ্ধ বাতাস, নিশ্চল, সোঁদা গন্ধ তাতে। সম্প্রতি ব্যবহারের ছাপ আছে টানেলের ভিতর। মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রত্যেকটা শাখা টানেলে খানিকটা ঢুকে পরীক্ষা করে করে এগোচ্ছে রানা। যে-কোন সময় ঘটে যেতে পারে যে-কোন কিছু। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে রানার। কানের ভিতরটা দপদপ করছে। নিজেকে ওর মাংসাশী এক শিকারী প্রাণী মনে হলো।

এখন আর ও শিকার নয়, শিকারীতে পরিণত হয়েছে। অনুভূতিটা ভাল লাগল ওর।

ডান পায়ের গোড়ালিতে বাধল কী যেন একটা। থেমে আস্তে করে পরখ করল। আড়াআড়ি ভাবে চলে গেছে একটা টানটান তার। ওটা অনুসরণ করে ডানদিকে ছোট একটা কালো বাক্স পেল। বুঝতে পারল না জিনিসটা হাই এক্সপ্লোসিভ না সতর্কতাসূচক অ্যালার্ম সিস্টেম। ওটা ডিঙিয়ে অন্ধকারে এগোল আবার। বুঝতে পারছে একটা ফ্ল্যাশলাইট থাকলে খুব ভাল হত। লিমুযিনের গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে নিশ্চয়ই ছিল। সুকো চ্যানের কাছে টর্চ ছিল না, তাকে নিশ্চয়ই অন্যরা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে ভিতরে।

বাতাস এখানে একটু অন্য রকম। ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। থামল রানা। মেঝে হাতড়ে দেখল কিছু পাওয়া যায় কি না। না, কিছু নেই। কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করছে। দেয়ালে হাত বুলাল। এবার পেল জিনিসটা। একটা ফটোসেল। কোন আভা নেই। তার মানে জিনিসটা ইনফ্রারেড অথবা আলট্রাভায়োলেট বীমের মাধ্যমে কাজ করে। এবং সেই বীমও অজান্তেই ভেঙে দিয়েছে।

এখন কি ও পিছিয়ে যাবে, না এগোবে? কোন সন্দেহ নেই সামনে ফাঁদ অপেক্ষা করছে। ফটোসেলটা কোমর সমান উঁচুতে ছিল। কুকুর-বিড়াল ওটার বীম ভাঙতে পারবে না। মানুষ ছাড়া আর কিছু আসেনি সেটা এখন জেনে গেছে শত্রুপক্ষ।

পা বাড়াল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক অস্ত্রের স্লাইডের মৃদু ক্লিক আওয়াজটা শুনতে পেল। শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করল ও। তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল অন্ধকার থেকে। ধপ করে একটা আওয়াজ। মেঝেতে পড়েছে কেউ।

যেন দোজখ ভেঙে পড়ল এবার। আধফুট দীর্ঘ কমলা আগুনের ঝিলিক বের হলো সাব-মেশিনগানগুলোর মাযল থেকে। ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দিল। এক সেকেন্ড আগে রানার মাথা যেখানে ছিল সেখানে এসে গাঁথল বেশ কয়েকটা বুলেট। শুয়ে পড়ে দেহ গড়িয়ে দিল রানা, গড়ানোর ফাঁকে আগুনের ঝিলিক লক্ষ্য করে নিয়মিত গর্জে উঠল ওর হাতের ওয়ালথার। দুটো সাব-মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেল। একজনের মরণ আর্তনাদ শুনতে পেল ও।

পাথরের মেঝেতে জুতোর খসখস আওয়াজ। সাব-মেশিনগানধারীদের সাহায্য করতে আরও লোক আসছে। এরা সতর্ক থাকবে। লী তাই হান নিশ্চয়ই গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে গেছে। লোকগুলোর কাছে কি ইনফ্রারেড গগল্‌স আছে? তা হলে পরিষ্কার ওকে দেখতে পাবে।

পাশে একটা টানেল পেয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। অন্ধকারে বার কয়েক হোঁচট খেল, তবে পড়ল না। আরেকটা শাখা টানেল পেতেই ওটার ভিতর ঢুকে পড়ল। কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তৈরি ওয়ালথার হাতে চুপচাপ অপেক্ষা করছে।

আসুক ওরা। ওয়ালথার খালি হলেও ওর কাছে এখন স্টিলেটো আছে। লোকগুলো আসবেই।

নিকষ কালো অন্ধকার চারপাশে। কংক্রিটের মেইন টানেলের ভিতর ভারী ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। নিজেদের যাতে গুলি না করে বসে সেজন্য আলো জ্বেলেছে লী তাই হানের লোকজন। রানার সামনে দিয়ে সাবধানী পায়ে পেরিয়ে গেল দু'জন, গায়ের সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট আর সাব-মেশিনগান ধরে রেখেছে। লোক দু'জনকে পেরিয়ে যেতে দিল রানা, তৃতীয় লোকটা এল খানিক পরে। এ একা। নিঃশব্দে তার গলা কাটল রানা স্টিলেটো দিয়ে। সামান্য গুঙিয়ে নেতিয়ে পড়ল লোকটা। তাকে টেনে শাখা টানেলের ভিতর এনে রাখল ও। হালকা ওজনের হেকলার অ্যান্ড কচ সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল হাতে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কেউ টের পায়নি তাদের সঙ্গীর মৃত্যু।

শাখা টানেল থেকে বেরিয়ে সামনে চলে যাওয়া লোকগুলোকে লক্ষ্য করে সাব-মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ল ও। কাতরে উঠল একজন। এক পশলা গুলি ছুঁড়েই চট করে আবার ফিরে এল রানা আগের জায়গায়। দু'জনের একজন পাল্টা গুলি করতে শুরু করেছে। জানে না কাকে গুলি করছে। নিজেদের সঙ্গীর গায়েই লাগল তার গুলি। পরস্পরের দিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দু'দিক থেকেই ভাবছে বাগে পেয়েছে রানাকে।

'আহ্! নাআআআ!' সুকো চ্যানের গলা চিনতে পারল ও। গুলি খেয়েছে ব্যাটা।

এই মাত্র খুন করা লোকটাকে সার্চ করল রানা। পকেটে একটা ছোট পিস্তল পেল। ওজন আর আবছা আকৃতি দেখে মনে

হলো অস্ত্রটা বেরেটা মডেল ৯০। ওটা কোমরে গুঁজে রাখল রানা। অস্ত্র যত বেশি থাকে ততই ভাল।

দু'পক্ষের গোলাগুলি কমে গেছে। এখনই উৎসাহিত না করলে থেমে যাবে। ক্রল করে মেইন টানেলে ঢুকল রানা, দু'পাশ লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়েই আবার অন্ধকারের সুযোগে আগের জায়গায় ফিরল। ওর সাব-মেশিনগানটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। ওটা একপাশে নামিয়ে রেখে দিল। দু'পাশ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল।

একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল। ঘড়ঘড় আওয়াজ। গলায় গুলি খেয়েছে কেউ। গালি দিচ্ছে কেউ একজন। দু'দিক থেকে তুমুল গুলি শুরু হলো। একটা বুলেট ঢুকল শাখা টানেলে, রানার মাথার উপরের পাথরে লেগে পিছলে চলে গেল। পিছাল রানা, ক্রল করে চলে এল টানেলগুলোর মিলনস্থলে। দুটো লাশ ছাড়া নেই কেউ। ওর খোঁজে ছড়িয়ে পড়েছে লোকগুলো। একটা লাশের পাশ থেকে পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিয়ে দু'দিক দেখল। বামদিকে একটা টানেলের মুখে আলোর আভাস দেখতে পেল। এখানেই প্রথম গোলাগুলি শুরু করে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে। কোনদিকে যাবে ভাবল রানা। সবদিক একই রকম মনে হলো। লাশ টপকে যে টানেলে আলো দেখেছে সেটাতেই ঢুকে পড়ল ও, সাবধানে এগোল। বুঝতে পারছে, এখন আর বাড়তি সুযোগ পাবে না, এতক্ষণে নিজের লোকদের সংগঠিত করে ফেলেছে নিশ্চয়ই লী তাই হান।

বাম পাশে আরেকটা টানেলের মুখ। মাথা সামান্য বাড়িয়ে উঁকি দিল রানা। দু'জন লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে, ফ্ল্যাশলাইট নেড়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মাথায় দুই গুলি খেয়ে তাদের কৌতূহলের চির অবসান হলো। ওয়ালথার হোলস্টারে রেখে পড়ে থাকা একটা পিস্তল তুলে নিল রানা। প্রহরী দু'জন নিশ্চয়ই বিনা কারণে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল না। পাহারা দিচ্ছিল কিছু। তার মানে

এপথে গেলেই দেখা হবে লী তাই হানের সঙ্গে। বিনা দ্বিধায় দ্রুত অথচ হালকা পায়ে দৌড়াতে শুরু করল ও। একটু পরই সামনে ইলেকট্রিক বাতির হলদে আভা দেখতে পেল। নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল রানা, পিস্তলটা কোমরের কাছে ধরা। ওর ধারণা যদি ঠিক হয় তা হলে ওদিকে আরও প্রহরী থাকবে। বাঁক নিয়েছে টানেল। ওখানে পৌঁছে উঁকি দিল রানা। ওর ধারণাই ঠিক। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন গার্ড।

ইচ্ছে করলে গুলি করে তাদের ফেলে দিতে পারে রানা। কিন্তু তা হলে ঘরের ভিতরের লোকগুলো জেনে যাবে ও এসে পড়েছে। কী করবে ভেবে নিল ও, তারপর এই পিস্তলটাও কোমরে গুঁজে নিয়ে লড়বড় লড়বড় করতে করতে বাঁক ঘুরে দুই গার্ডের দিকে দৌড়ে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে পিস্তল তাক করল গার্ড দু'জন।

'লী তাই হান!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে!'

'উনি নির্দেশ না দিলে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিতে মানা করা আছে,' বামদিকের গার্ড বলল।

'অ্যাই তুমি...' ডানদিকের গার্ডের গলায় সতর্কতার সুর ফুটে উঠল।

কথাটা শেষ করতে পারল না লোকটা, তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি খেয়ে দু'ভাঁজ হয়ে গেল। চোখ দুটো দেখে মনে হলো পিংপং বল, এখনই মেঝেতে পড়ে লাফিয়ে উঠবে। ধপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান লোকটা। ঠং করে কংক্রিটের মেঝেতে পড়ল পিস্তলটা।

লাথি মেরে থামেনি রানা, ঘুরেই বামদিকের গার্ডের গলায় ঘুসি মেরে বসেছে। ঠিক অ্যাডামস অ্যাপেলে লাগল ঘুসিটা। ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল রানার কব্জি। হাতের পোড়া জায়গাগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিল ও, নতুন করে মনে পড়ল।

দ্বিতীয় ঘুসি মারল ও বিস্মিত লোকটার নাকের মাঝখানে। ওখানে ঠিক মত আঘাত করতে পারলে নাকের কার্টিলেজ ব্রেইনে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। রানার ঘুসিটা ঠিক মতই লেগেছে। কাটা কলাগাছের মত পড়তে শুরু করেছিল গার্ড, আস্তে করে শুইয়ে দিল রানা।

জীবিত গার্ডকে দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল। এক ঘণ্টার আগে চেতনা ফিরবে না লোকটার। সেমি-অটোমেটিক দুটো সংগ্রহ করে নিল ও। স্লাইড টেনে দুটোর চেম্বারেই বুলেট ঢোকাল, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে।

দরজাটা ভেড়ানো আছে। ভিতর থেকে সরু এক চিলতে আলো আসছে। লাথি মেরে দরজাটা খুলল রানা, দু'হাতে দুই পিস্তল সহ ভিতরে ঢুকল। এক সেকেন্ডও দেরি হলো না ওর দুটো পিস্তলের একটা লী তাই হান আর অন্যটা জোনাথন হার্কারের বুকে তাক করতে। রানাকে দেখে হার্কারের চেহারাটা বিদঘুটে হয়ে গেল, যেন পাছায় ডেয়ো পিঁপড়ের কামড় খেয়েছে।

সামান্য ভ্রূ উঁচু করল লী তাই হান, এছাড়া তার চেহারায় আর কোন পরিবর্তন এলো না।

'তা হলে, মিস্তার রানা, আপনি এখনও এপারেই আছেন। আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! বিড়ালের জান আপনার। যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। আপনার বুঝি তুলনা হয় না। বিসিআই সম্বন্ধে আমার ধারণা কয়েক ডিগ্রি উঁচু হয়ে গেল।'

'শুনে খুশি হলাম,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'তুমি তো জানো আমি কেন এসেছি।'

'আমরা বোধহয় একটা রফায় আসতে পারি, মিস্তার রানা, মৃদু হাসল লী তাই হান।

'কেন?' ভ্রূ নাচাল রানা। 'তোমাকে বাগে পেয়েছি আমি।'

'আপাতত,' স্বীকার করল তাইওয়ানিজ এজেন্ট। তাকে দেখে মনে হলো না বুকের দিকে তাক করা পিস্তলের কারণে সামান্যতম

বিচলিত। 'ইচ্ছে করলে গুলি করতে পারেন আমাদের। মিস্তার রানা, আমার কিছু হারাবার নেই।'

'লেযার সুইচটাও নয়?' দুটো পিস্তলের ট্রিগারে একই সঙ্গে আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে রানা।

মানসিক চাপটা সইতে পারল না হার্কার, চেয়ার ছেড়ে ডাইভ দিল মেঝেতে। সবটা যেন স্লো মোশনে ঘটে গেল। লোকটাকে অনুসরণ করল রানার বাম হাত, ট্রিগারে চাপ দিল তর্জনী জোরাল ঝাঁকি খেল ওর কব্জি। বদ্ধ ঘরে আওয়াজটা কানে তালা ধরিয়ে দিল। মাথার পিছনে গুলি খেল হার্কার, এক মুঠো চুল আর রক্ত ছিটকে উঠল। মরেনি লোকটা, ডাঙায় তোলা মাছের মত তড়পাচ্ছে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। মাথায় হাত দিতেই রক্তে ভরে গেল হাতটা।

লোকটার প্রতি মনোযোগ দেওয়া ঠিক হয়নি রানার, ও দিকে কালো লেযার সুইচটা ছুঁড়ে দিয়েই পাশের একটা করিডর ধরে ছুটে বেরিয়ে গেল লী তাই হান। রানার গুলি তার পাশে পাথরের দেয়ালে লাগল। খপ করে কালো বাক্সটা ক্যাচ ধরে রানা পিস্তল ফেলে। রানা সামলে নেওয়ার আগেই ঘরের কোণ থেকে সামান্থাকে হেঁচড়ে নিজের সামনে নিয়ে এলো হার্কার এমন ভাবে ধরে আছে যে তাকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব। মহিলা ঘরে ছিল এক পলক দেখেছিল রানা, কিন্তু ওর মনোযোগ ছিল হার্কার আর লী তাই হানের উপর।

'পিস্তলটা ফেলো, মাসুদ রানা, নইলে মেয়েলোকটাকে খুন করে ফেলব।' শীতল শোনাল হার্কারের গলা।

এক হাতে সামান্থার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে সে, আরেক হাত মহিলার মাথার পিছনে। জোরে একটা ঝটকা মারলেই সামান্থার ঘাড় ভেঙে যাবে।

'তাতে তোমার কী লাভ,' হাতের বাক্সটা দেখাল রানা। 'সুইচিং ডিভাইসটা এখন আমার কাছে।'

সামান্থার চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। বুঝতে পারছে একটু এদিক ওদিক কিছু হলেই মারা পড়বে সে। মুখটা বাঁধা, তাই চিৎকার করতে পারছে না।

'তোমার তাই ধারণা?' ব্যথা সত্ত্বেও বাঁকা হাসল হার্কার। 'সুইচটা নকল। নইলে তুমি কি মনে করো লী তাই হান এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রাখত? আসলটা আমি বাইরে লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

'কোথায়?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী। হাতেরটা পরীক্ষা করে দেখো বরং।'

ওজনটাই এতো কম যে লোকটার কথা বিশ্বাস করে ফেলত রানা। হার্কারের চেহারাই জানাচ্ছে মিথ্যে বলছে না লোকটা।

'আমি যাচ্ছি।' সামান্থাকে সামনে ধরে লী তাই হান যে-করিডর ধরে বেরিয়ে গেছে, সেদিকে আস্তে আস্তে পিছাতে শুরু করল হার্কার।

'আমার তা মনে হয় না,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'অনেক বেশি সিনেমা দেখো তুমি। হিউম্যান শিল্ড সবসময় কাজে দেয় না।'

জবাবে সামান্থার ঘাড়ে হাতের চাপ বাড়াল হার্কার। 'সাবধান, রানা!'

গুলি করল রানা। ঘরের ভিতর যেন বজ্রপাত হলো। সামান্থা আর হার্কার, দু'জনই মেঝেতে পড়ে গেল।

সামান্থাকে হাত ধরে উঠতে সাহায্য করল রানা। তার চুলে সিঁথি কেটে হার্কারের ডান চোখে গিয়ে ঢুকেছে রানার বুলেট।

শকটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও সামান্থা, দাঁড় করিয়ে ধরে রাখতে হলো। মুখের বাঁধন খুলে দিল রানা। লাশটা দেখল মহিলা। ছিন্নভিন্ন খুলিটা দেখে ঢোক গিলে রানার দিকে তাকাল।

আস্তে করে তাকে ঝাঁকি দিল রানা।

'তুমি···তুমি আমাকে গুলি করেছ, রানা!' বড় করে শ্বাস নিল সামান্থা। বেতশ পাতার মতো কাঁপছে।

'হার্কারকে গুলি করেছি।' সামান্থাকে ছেড়ে দিল রানা। ওর গলায় তাগাদার সুর ফুটল। 'তুমি জানো লেযার সুইচিং ডিভাইসটা কোথায়? হার্কার ওটা লুকিয়ে রেখেছে।'

'জানি না।' শিউরে উঠল সামান্থা। 'তবে আমাকে যখন ধরে আনল তখন ওর কাছে আসলটা ছিল। লী তাই হানের সঙ্গে দেখা করার আগে লুকিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'ও কি গাড়িতে করে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

সামান্থার হাত ধরে টান দিল রানা। 'কোথায় রেখেছে ওটা?'

'দূরে রেখে এসেছে।' হাতের ইশারায় লী তাই হান যে টানেল দিয়ে বেরিয়ে গেছে সেটা দেখাল সামান্থা।

ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। সময় পেলে লী তাই হান ওটা সংগ্রহ করে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে ও এখানে।

বারো

'জলদি!' সামান্থার হাত ধরে টান দিল রানা, ঢুকে পড়েছে নির্দিষ্ট টানেলে।

'এক মিনিট!' বাধা দিল সামান্থা। 'ওদিকে গার্ড আছে। বেশ কয়েকজন। প্রত্যেককে সাব-মেশিনগান দেয়া হয়েছে।'

'তা হলে ওদের মাঝ দিয়েই পথ করে নিতে হবে।' হাঁটতে শুরু করল রানা। টানেলের ভিতরটা অন্ধকার। অন্য যেসব টানেলে রানা আগে ঢুকেছে সেগুলোর সঙ্গে এটার একমাত্র পার্থক্য এটাতে মুখে এসে লাগছে ভেজা বাতাস। কাছেই কোথাও তীরে এসে মাথা খুঁড়ছে প্রশান্ত মহাসাগর। চলার গতি আরও বাড়াল রানা।

তিরিশ ফুট যাওয়ার পর সামনে থেকে সাব-মেশিনগানের স্লাইড টানার আওয়াজ পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে বামহাতের পিস্তলটা আওয়াজ লক্ষ্য করে খালি করল রানা। পিছলে পড়ার খসখস শব্দ পেল। বুঝতে পারল লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে। আবার এগোল ওরা। সামান্থা পিছনে। আরেকটু হলেই লাশটার গায়ে পা বেধে আছাড় খেত রানা। ডান হাতের পিস্তলটা সামান্থাকে দিয়ে সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল ও। পরীক্ষা করে দেখল, কক করাই আছে।

বেশ খানিকটা দূরে টানেলের মুখ দেখতে পেল ওরা। আরেকটু এগোতেই ওখান থেকে গর্জে উঠল একটা সাব-মেশিনগান। থেমে থেমে গুলি করছে। ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো। মাটিতে শুয়ে পড়তে হলো ওদের। মাথার উপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে এখন বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো। সামান্থাকে হাতে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে সাব-মেশিনগান হাতে ক্রল করে এগোল রানা।

বাইরের লোকটা দক্ষ। গুহার মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে না সে। ফলে আবছা কোন আকৃতিও দেখতে পাচ্ছে না রানা। আবার বেড়ে গেছে কুয়াশার ঘনত্ব। শীতল ভেজা ভেজা আবহাওয়া। করুণ সুরে বেজে উঠল একটা ফগহর্ন। আকাশে একটা লাল ফ্লেয়ার বিস্ফোরিত হতে দেখল রানা। লী তাই হানকে বোধহয় ফ্রেইটার থেকে সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছে। লোকটা লেযার সুইচটা পেয়ে গেছে কি না কে জানে!

সুড়ঙ্গমুখের পনেরো ফুটের মধ্যে গিয়ে থামল রানা। লোকটা বাইরেই আছে। টানেলের ভিতর নল ঢুকিয়ে মাঝে-মধ্যে গুলি করছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল রানা। চোখ সরু করে টানেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এক কোনা থেকে দেখা দিল লোকটার মাথা। সাব-মেশিনগানটা টানেলের ভিতরে তাক করছে। তাকে গুলি করার কোন সুযোগ দিল না ও, ট্রিগারে চাপ পড়ায় ওর সাব-মেশিনগান থেকে এক পশলা বুলেট ছুটে গেল গার্ডকে লক্ষ্য করে। হোঁচট খেতে খেতে পিছাল লোকটা, তারপর চিত হয়ে পড়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল রানা। সামান্থাও চলে এসেছে ওর পাশে। পাশাপাশি পা বাড়াল ওরা, বাইরে আরও কেউ আছে কি না দেখার জন্য টানেলের মুখের কাছে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। নেই দেখে নিয়ে তারপর চলে এলো বাইরে।

সামান্থার বাহুতে হাত রাখল রানা। 'হার্কার কোথায় গাড়ি রেখেছে? ওটাতে সুইচটা আছে কি না খুঁজে দেখতে হবে।'

'ওদিকে,' হাত তুলে বামপাশ দেখাল সামান্থা। 'যতদূর আমার মনে পড়ে ওদিকেই কোথাও।'

কোমর থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে স্লাইড টেনে চেম্বারে গুলি ঢোকাল ও, তারপর দৌড়াতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করছে সামান্থা। সামনে কালো একটা চৌকো আকৃতি চোখে পড়ল। কুঁজো হয়ে এগোল রানা। এই সামান্য সতর্কতা ওর জীবন বাঁচাল। হালকা পায়ের আওয়াজ হয়েছিল, সেটা শুনে গাড়ির ব্যাক সিটে বসা কেউ একজন রাইফেলের নল বের করে গুলি করতে শুরু করল। তিনটা গুলি করল রানা লোকটাকে লক্ষ্য করে। ওদিক থেকে রাইফেলের গুলি বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির সামনের দিক থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল আরেকটা ছায়ামূর্তি। রানার আরও দুটো গুলি ব্যয় হলো লোকটাকে শেষ করতে। শেষ গুলিটার পর ওর অটোমেটিকের স্লাইডটা খোলা অবস্থায় রয়ে

গেল। আর গুলি নেই। অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে ওয়ালথার বের করল রানা। গাড়ির পাশের আড়ালে উবু হয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। সৈকতে ঢেউয়ের কলকল-ছলছল আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বাতাসে ধীরগতিতে আগুপিছু করছে ঘন ধূসর কুয়াশা।

গাড়ির দরজার উপর দিয়ে উঁকি দিল ও। জীবিত কেউ নেই ভিতরে। এবার দ্রুত হাতে পুরো গাড়ির ভিতরটা সার্চ করতে শুরু করল। ব্যাক সিটের মাঝখানে সরু একটা চেরা ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আছে ফোম আর স্প্রিং। ওই ফাটলের মধ্যে সুন্দর ভাবে বসে যেতে পারত লেযার সুইচটা।

লী তাই হান ওটা পেয়ে গেছে!

পরপর তিনবার বাজল ফ্রেইটারের হর্ন। কুয়াশার ভিতর দিয়ে ওটার আবছা আকৃতি দেখতে পেল ও, তীর থেকে কয়েকশো গজ দূরে অপেক্ষা করছে। সার্চ লাইট জ্বেলে সৈকতে আলো ফেলা হলো। সেই আলোয় দেখা গেল একদল লোক নৌকায় উঠছে। 'গুলি করো!' সামান্থাকে নির্দেশ দিল রানা। নিজেও গুলি করতে শুরু করেছে। তাড়াহুড়ো করছে না, লক্ষ্যস্থির করে একটা একটা গুলি করছে।

'এখন কী করব আমরা, রানা?' উত্তেজনায় কাঁপছে সামান্থার গলা।

'আমি ওখানে যাচ্ছি, তুমি কাভারিং ফায়ার করো।'

হার্কারের গাড়ির পিছনের সিটে পড়ে থাকা মৃত লোকটার রাইফেল সামান্থার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। নির্দেশ পালন করছে কি না সেদিকে লক্ষ না দিয়ে দৌড় দিল ও সৈকতের দিকে। টিলার গা বেয়ে নেমে গেছে সরু একটা আঁকাবাঁকা পথ, ওটা ধরে দ্রুত পায়ে নামছে। পিছন থেকে রাইফেলের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে বুঝতে পারল, ঠিক মতোই নির্দেশ পালন করছে সামান্থা।

সৈকতে নেমে এসে চারটে সাব-মেশিনগানের লক্ষ্যে পরিণত

হলো ও। বালিতে একটা ঢালের পিছনে উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে অপেক্ষা করল রানা, লোকগুলো আবার গুলি করলে মাযল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে গুলি করবে। সামাছার রাইফেলের হুঙ্কারের পর থেমে গেল একটা সাব-মেশিনগান।

দু'জন এক নাগাড়ে গুলি করছে সামাছার অবস্থান লক্ষ্য করে। তৃতীয়জন আটকে রাখবে রানাকে। মাযল ফ্ল্যাশের ঝিলিকে লোক তিনজনের চেহারাও আবছা ভাবে দেখতে পেল রানা। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল ও। সামাছার দিকে গুলি করতে ব্যস্ত লোক দু'জন সাব-মেশিনগান ফেলে দিয়ে ঢলে পড়ল। তৃতীয় লোকটা ভয় পেয়েছে। আতঙ্কিত একটা চিৎকার ছেড়ে পানিতে নেমে পড়ল সে, ছপছপ পানি ভেঙে নৌকার দিকে ছুটছে। মাথায় রানার গুলি খেয়ে পানিতে ডুবে গেল তার লাশ।

'গুলি করবেন না!' আর্তি জানাল নৌকার পাশে অপেক্ষমাণ লোকটা। 'আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই।'

মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। লী তাই হান তাকে যেভাবে চড় মারল তাতে লোকটাকে প্রায় বিশ্বাস করে ফেলল রানা। ফ্রেইটারটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দুশো গজ দূরে। মাঝি বুঝে গেছে এতটা পথ সে গোলাগুলি এড়িয়ে নৌকা নিয়ে পৌঁছাতে পারবে না।

'মিস্তার রানা,' চাপা গলায় বলল লী তাই হান। 'শেষ পর্যন্ত জিতলেন আপনি। গুদ শো।'

ওয়ালথারটা সরাসরি লোকটার বুকে তাক করল রানা, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে। 'সুইচটা দাও, হান।'

'এই যে।' রানার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলল সুইচটা লী তাই হান। লোকটার দিক থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে ওটা তুলে নিল রানা। স্লাইড সরিয়ে ভিতরে তাকাল। হ্যাঁ, সাদাটে কাচ রাতের আবছা আলোয় ঘোলা দেখাচ্ছে।

শরীরটা ঘুরিয়ে নিল লী তাই হান, তারপরই রানার মুহূর্তের

অমনোযোগিতার সুযোগে ছুঁড়ে দিল তার হাত-পাখা। ওয়ালথার তুলে ওটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করল রানা। খট করে ভারী জিনিসটা বাড়ি খেল পিস্তলের সঙ্গে। ছিটকে রানার হাত থেকে পড়ে গেল ওয়ালথার।

'এবার, মিস্তার রানা, দেখা যাক কে সেরা,' আরেকটা হাত-পাখা বেরিয়ে এসেছে লী তাই হানের হাতে।

রানার ওয়ালথারটা হাতে পাবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাঝি। স্টিলেটো ছুঁড়ে দিল রানা। ঘ্যাচ করে লোকটার গলায় আমূল গাঁথল ওটা। গলা চেপে ধরে কয়েকটা গড়ান দিল লোকটা, জবাই করা গরুর মত আওয়াজ করছে।

পিছনে পায়ের শব্দ পেল রানা। সামান্থা নেমে আসছে। 'তোমার খেলা শেষ, হান,' শ্বাসের ফাঁকে বলল ও। ঘুরছে ও লী তাই হানের দিকে চোখ রেখে। চারের মতো আকৃতিতে হাত-পাখা ঘোরাচ্ছে লোকটা, সমস্ত মনোযোগ রানার দিকে।

টাশ করে একটা আওয়াজ হলো। রাইফেলটা বোধহয় খালি হয়ে গেছে, অটোমেটিক দিয়ে গুলি করেছে সামান্থা। বুক চেপে ধরে পড়ে গেল লী তাই হান। হাত-পাখাটা তার সামনে পড়েছে। ওটা তুলতে চেষ্টা করল। রানার চোখে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে তার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল। 'মিস্তার রানা, তুমিই জিতলে,' বলল ফিসফিস করে। 'তবে অন্যের সাহায্যে।'

চোখ বন্ধ হয়ে গেল লী তাই হানের। একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল লোকটার দেহ।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। সরাসরি ওর দিকে পিস্তল ধরে পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সামান্থা। 'লেযার সুইচটা দাও, রানা।' অদ্ভুত শান্ত শোনাল তার গলা। 'ওটা আমাদের জিনিস।'

'না,' আপত্তির সুরে বলল রানা। 'সুইচটা ডক্টর আহমেদের। তিনি চাননি এটা আমেরিকানদের হাতে পড়ুক।'

পিস্তল নাড়ল সামান্থা। 'না, রানা। ওটা আসলে আমাদের,

আমেরিকানদের। অ্যালিকে তার কাজের জন্য যথেষ্ট বেতন দেয়া হয়েছে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল রানা, 'সিআইএর সঙ্গেই আছ তা হলে?'

পিস্তলটা রানার বুকে তাক করল সামান্থা। 'অবশ্যই! তবে সক্রিয় এজেন্ট এখন আর নই আমি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে ভালবাসোনি ডক্টর আহমেদকে? শুধু অভিনয় করে গেছ?'

মৃদু হাসল সামান্থা। 'প্রয়োজনের খাতিরে অনেক কিছুই করতে হয়।' পিস্তলটা নাড়ল। 'এবার সুইচটা দাও, রানা।'

মুঠো শক্ত করল নির্বিকার রানা। গায়ের জোরে সুইচটা পিষল। মুড়মুড় একটা আওয়াজ হলো ওর মুঠোর ভিতর। মুঠো খুলে পোড়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই যাহ্, ভেঙে গেল!'

'না!' এক পা সামনে এগোল সামান্থা।

হাতের তালু সামান্থার দেখার জন্যে মেলে দিল রানা। কিছু ভাঙা সার্কিটের টুকরো আর কাঁচের খানিকটা গুঁড়ো আছে শুধু ওর অগ্নিদগ্ধ হাতের তালুতে।

থরথর করে কাঁপছে সামান্থার পিস্তল ধরা হাত। রানার দিকে আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

শ্বাস আটকে অপেক্ষা করল নিরস্ত্র রানা। সময় যেন ধীর হয়ে গেছে।

আঙুলের চাপ বাড়িয়েও আবার তর্জনী সরিয়ে নিল সামান্থা ট্রিগার থেকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাকে খুন করা উচিত ছিল, কিন্তু পারলাম না, রানা। তুমি কয়েকবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কিন্তু...'

পরস্পরের চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা।

আবার ফগহর্ন বাজাল ফ্রেইটার। ওটার উজ্জ্বল সার্চ লাইট সৈকতে এসে পড়ল। তার পরপরই নোঙর তোলার শব্দ হলো।

রওনা হয়ে যাচ্ছে তাইওয়ানিজ ফ্রেইটার। তাদের এবারের মিশন ব্যর্থ।

আস্তে করে স্টিলেটো তুলে রক্ত মুছে খাপে পুরল রানা, ওয়ালথারটা তুলে নিয়ে শোল্ডার হোলস্টারে গুঁজে একবারও পিছনে না তাকিয়ে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল। যে-কোন মুহূর্তে সামান্থার তরফ থেকে গুলির আশঙ্কা করছে ও। বড্ড ক্লান্তি লাগছে। শরীর যেন ভেঙে আসছে ওর। ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ।

পিছন থেকে সামান্থার চাপা গলা শুনতে পেল। 'পালাও, রানা! সিআইএ ঠিকই জানবে কে সুইচটা নষ্ট করেছে। ওরা তোমাকে ছাড়বে না!'

***

মাসের নাম উল্লেখ করলে খুশি হবো।

● মাস উল্লেখ না করার উপযুক্ত কারণ আছে। তার পরেও আপনার প্রস্তাবটি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা হবে। ...আপনি কি ব্যাক কাভার পড়েও মনে করতে পারেন না ওটা আগে পড়েছেন কি না? কেনার আগে ভেতরের দুই-একটা পৃষ্ঠা পড়ে দেখলে হয়তো মনে পড়বে। ধারণা করছি, আপনি মাঝে-মধ্যে পড়েন, তাই এই স্মৃতিবিভ্রম; সিরিয়াল ধরে পড়ে গেলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। ...এখনও পড়ছেন বলে আপনাকে অভিনন্দন।

হিমেল,

পূর্ব চাঁদকাঠী, ঝালকাঠী।

সবে মাত্র 'প্রজেক্ট এক্স-১৫' কিনেছি। এখনও পড়িনি। তবে উল্টাতে গিয়ে কবীর চৌধুরীর নাম দেখে যে কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছি তা অপ্রকাশযোগ্য। আমি নিশ্চিত ছিলাম ক.চৌ. আবার আসবে। ওকে যে আসতেই হবে। এবার আমার একটা পর্যবেক্ষণের কথা বলি। বিসিআইকে আমি নাম দিয়েছি 'এতিম খানা'। কারণ এ-প্রতিষ্ঠানের সবাই এতিম। রানা, সোহানা, রূপা, জাহিদ, সলিল, দীনা, সোহেল, নীলা, ইলোরা এমনকি নবীস পবনকেও এতিম করে দিলেন। তবে রানা এজেন্সি এতিমখানা নয়। হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা আপনার জন্য। কেন? এখন বলা যাবে না!

● তাহলে আপনার চিঠির উত্তরটাও আমি পরে দেব। তবে ভালবাসা জানাতে আপত্তি নেই। শুভেচ্ছা রইল।...এতিম কেন হবে? বাপটা তো বেঁচে আছে এখনও।

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, পাশের মনোগ্রামটি লক্ষ করুন। বই কেনার আগে মনোগ্রামটি দেখে বুঝে নিন, বইটি সেবা প্রকাশনীর কি না। ইদানীং কিছু প্রকাশনী আমাদের অনুকরণে একই আকার ও একই ধরনের মনোগ্রাম ও প্রচ্ছদ সংবলিত পেপার ব্যাক বই বের করছে। আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে যে, সেবা প্রকাশনীর বই মনে করে নিম্ন মানের বই কিনে পাঠক/পাঠিকা অনেকেই ঠকছেন। মনোগ্রামটি খেয়াল রাখলে আশা করি সেবার বই মনে করে অন্য প্রকাশনীর বই কিনে ভবিষ্যতে আপনাকে ঠকতে হবে না।